কাশ মাটি মন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

অ
বশী হ
ালাপো
ারান্দার
একটা পু
বড় বিড়

এক

গেলেও ক রাত্রি প্রভাত হলো।

গায়ত্রী রত্নেশ্বর দরজায় আঘাত দিয়ে বলে গেলেন, বিমল, ওঠ
বলে পুত্রের নিকট হতে উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তি
স্নানাহ্নিকের জন্য নগ্নগাত্রে কলতলার দিকে চলে গেলেন। তি
জানতেন বিমল এ-আহ্বানে সাড়া দিক আর না দিক সে জেগেছে

নিতান্ত বৃদ্ধ না হলেও বয়স তাঁর পঞ্চাশোর্ধে গিয়েছে এ
গত কয়েক বৎসর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় এক প্রকার অকর্মণ্য হয়ে
পড়েছেন। তাঁর দুই সংসার। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুজনেই এ
দারিদ্র্য-ক্লেশ হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। প্রথমা রেখে গেছে
একটি কন্যা; নাম—গায়ত্রী। বয়স সাতাশ কিংবা আটাশ
দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের পরেই সে বিধবা হয়েছে। দ্বিতীয়ার এক
পুত্র; নাম—বিমল। অবিবাহিত তরুণ,—বয়স প্রায় পঁচিশ।

বাড়ীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র।

কলকাতার মত সহরে বেশী ভাড়া দিয়ে ভাল বাড়ীতে উঠে
যাবার মত শক্তি-সামর্থ্য ছিল না বলেই কোন রকমে তারা তিন
প্রাণী বহুকাল যাবৎ এই বাড়ীতেই মাথা গুঁজে পড়ে আছে।

দুটি মাত্র ঘর,—একটি বড়, একটি ছোট।

বড় ঘরটির মাঝে চটের পর্দা টাঙ্গিয়ে তাকেও আবার দু
সমান অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

বাইরে একটুখানি বারান্দা। তার মাথার উপরে কয়ে
কেরোসিনের ভাঙা টিন এবং কাঠের চৌকো-বাক্সের ভি

তক পায়রা থাকে। সন্তান-সন্ততি নিয়ে তারা যে
া সংবাদ এ বাড়ীর কেউ জানে না।
থা ঝটপট করে অতি প্রত্যুষে তারা বের হয়ে যায়
নিজেরাই সংগ্রহ করে এক সময় সকলের অল
এই জীর্ণ আশ্রয়ে ফিরে আসে।
কণদিকের প্রাচীব গাত্র হতে ফুটা টিনের অ
রসর দুটি ঘর বেব করা হয়েছে।
টি রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়, অপবটিতে জ
ছাট চৌবাচ্চা।

সম্মুখে একটুখানি ছোট উঠোন। তুলসীমঞ্চের চাবদিকে কয়েকটি মরশুমি ফুলেব গাছ বসানো হয়েছে।

গলিরাস্তার সম্মুখে সদর দবজা; তার একপাশে বৈঠকখানার জন্য মাটির — বাঁশের বাঁকারি দিয়ে যে ক্ষুদ্র ঘরখানি াতিরিক্ত স্যাঁৎসেতে বলে তা এখন মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

সম্প্রতি সদ্য-প্রসূতা ভুলি কুকুরটা তার পাঁচ-ছয়টি সন্তান নিয়ে তারই এক কোণে পড়ে থাকে। শীতে তাদের কষ্ট হবে বলে কে যেন নিকটবর্তী আস্তাবল থেকে এক বোঝা শুক্‌নো ঘাস এবং তার উপর কখানা পুরু চট্, ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে বিছিয়ে দিয়েছে।

উঁচু না হলেও উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি দুটো প্রাচীর, পাশের খৃষ্চান এবং মুসলমান পরিবারের সংস্রব হতে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে পৃথক করে রেখেছিল কিন্তু গত বৎসর ভূমিকম্পের ধাক্কাতে উত্তর দিকের প্রাচীরখানি আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে উঠোনের একপাশে পড়ে গেছে। ইটগুলো ও-ধারের ভাড়াটের উঠোনে পড়েছিল বলে রক্ষা, নইলে এ পাশে পড়লে পরিষ্কার করবার লোকের অভাবে হয়ত অপরিসর উঠোনটুকু নোংরা হয়েই থাকত।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই এ বৎসর শীতের প্রকোপ একটুখানি বশী হয়ে উঠেছিল। বেলা তখন প্রায় দশটা। শতচ্ছিন্ন মলিন গালাপোষখানি গায়ে দিয়ে, রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরে রত্নেশ্বর বারান্দার উপর বসে ছিলেন। সম্মুখে একখানা বিষ্ণুপুরাণ ও একটা পুরাতন পঞ্জিকা পড়েছিল এবং বহুক্ষণ হতে আপন মনে বিড় বিড় করে যে সব কথা তিনি উচ্চারণ করতে ছিলেন, শুনতে পেলেও কারও তার একবর্ণ বুঝবার উপায় ছিল না।

গায়ত্রী এরই মধ্যে স্নান করে একপিঠ ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে সেই ছোট রান্নাঘরটির ভিতর রাঁধছিল।

মাথার উপরে ভাঙা টিনের ছিদ্রপথে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে বিধবা-তরুণীর শান্তোজ্জ্বল মুখখানি অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল।

বিমল ভাত খেয়ে এখনই বেরিয়ে যাবে, তাই সে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধনাদি সেরে নিচ্ছিল।

টেবিলের উপর নামানো ছোট 'টাইম্‌পিস্‌' ঘড়িতে বহুক্ষণ দশটা বেজে গেছে দেখে ঘরের ভিতর হতে বিমল ডাকল, আর দেরি কত দিদি?

ডাক শুনে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন হাতে নিয়ে বিমলের ঘরে প্রবেশ করল।

পরিষ্কার ঘরের মেঝের উপর আসনখানি পেতে দিয়ে বলল, একটু দেরিই বা হলো বিমল, সাহেব তো তোকে গিলে ফেলবে না?

বিমল বলল, না। তা বলছি নে দিদি, তোর যদি রান্না না হয়ে থাকে ত না হয় আর একটু বসি।

না, বসতে হবে না। বলে আসনের পাশে জলের গ্লাস নামিয়ে দিয়ে গায়ত্রী বের হয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরে ভাতের থালা নিয়ে হাজির হলো।

কিছুক্ষণ পরে গায়ত্রী দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল, বিমল, আর কিছু আনব কি?

না, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। বলে বিমল উঠে দাঁড়াল

কলতলা থেকে আঁচিয়ে ফেরবার সময় বিমল দেখল, গায়ত্রী বাপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিমল মনে মনে হঠাৎ একটা বড় তীব্র বেদনা অনুভব করল।

কাল একাদশী গিয়েছে—সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাসের পব, গায়ত্রী আজ এখনও হয়ত কিছু মুখে দেয় নি। কি একটা কথা সে তাকে জিজ্ঞেস করতে গেল, কিন্তু বিমলের মুখ দিয়ে সে কথাটা যেন আর বেব হল না। কোথায় যেন বাধা পেয়ে আটকে রইল।

গায়ত্রী বলল, বাবা, একটুখানি সবে বসো না, জায়গাটা পরিষ্কার করে দি। খাবার ঠাঁই করে দেব।

রত্নেশ্বর আপন মনে কি যেন বলছিলেন; গায়ত্রীর কথাটা শুনতে পেলেন না, একবার মুখ তুলে চাইলেন মাত্র।

বিমল বলল, বাবা, একটু সরে বসুন।

তিনি মুখে কিছু না বলে ধীরে ধীরে উঠলেন।

কম্বলের যে আসনখানির উপর বসেছিলেন, সেখানি হাতে করে তুলতে যাচ্ছিলেন, গায়ত্রী তাড়াতাড়ি সেখানি তুলে নিয়ে একটু দূরে পেতে দিল এবং পুবাণ ও পঞ্জিকা দুটি তাঁর চোখের সুমুখে নামিয়ে রাখল।

রত্নেশ্বর আসনেব উপর চেপে বসে ডাকলেন, বিমল, শোন। এইখানে বোস।

বিমল পিতার সম্মুখে হেঁট মুখে বসল।

রত্নেশ্বর পুনরায় একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। বিড় বিড় করে কতকগুলো কি বলে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, পুরাণ পড়েছিস?—বিষ্ণুপুরাণ? না? তবে বি-এ পাশ করলি কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে?

বলে ঈষৎ হেসে পুরাণখানি পুত্রের আনত মস্তকে একবার স্পর্শ করিয়ে পুনরায় নামিয়ে রাখলেন।

বললেন, রজি রাজার উপাখ্যান পড়ছিলুম। এই পৃথিবীর মানুষ,—সে-ও একদিন স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার করেছিল। বেখে দে তোর পৃথিবীর সম্রাট! স্বর্গ! স্বর্গ! যেখানে ইন্দ্রদেব রাজত্ব করেন। বৃহস্পতির কূটচক্রে যেই তাদেব নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটলো, আবার তারা পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীতেই ফিরে এলো। চরিত্র! চরিত্র-বল! বুঝলি কিছু? না, ঘোড়ার ডিম?

বিমল ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বুঝলুম বাবা।

—তবে যা। দূর হ! বলে চক্ষু মুদ্রিত করে তিনি আবার বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন।

বিমল সেখান হতে উঠে চলে যাচ্ছিল, পুনরায় তাকে ডেকে বললেন, বোস, বোস বাবা, বোস, অনেক বকলুম। শোন।

বলে তিনি তার সামনে পুরাতন পঞ্জিকাখানা খুলে ধরলেন। কোন-এক নার্শারীর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় কপি, মূলা ও বেগুনের ছবির উপর নজর পড়তেই বললেন, ছ্যাখ ছ্যাখ, কেমন ছবি দেখেছিস?

পিতা যেমন ক্রন্দন-রত অভিমানী ছোট ছেলেকে ছবি দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেন, রত্নেশ্বর তেমনি ভাবে একটা ছবির উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এটা কি রে বিমল! কিসের ছবি?

বিমল তার পাগল পিতাকে বেশ ভাল করেই চিনত, তাই ধীরে ধীরে বলল, ওটা ফুল-কপির ছবি। কি হবে বাবা ওসব দেখে?

—কি হবে? এ পাগল ছেলে বলে কি মা?

বলে বোধ করি গায়ত্রীর উদ্দেশে একবার মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু গায়ত্রীকে দেখতে না পেয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, ওই যে ওখানে ফুলের গাছগুলো কি জন্যে পুতেছিস? সিদ্ধ করে খাবার জন্যে?

টান মেরে উঠিয়ে ফেলে দে না ও-সব? ওইখানে যদি বিশ-ত্রিশটা কপির চারা দিতিস তাহলে খেয়ে বাঁচতিস। ভাগ্যিস আমি এই লঙ্কা গাছটা পুঁতেছিলুম, তাই লঙ্কা কিনতে হয় না। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি! পড়িস নি মুখখু? বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

পিতাকে খেতে দেবে বলে গায়ত্রী এতক্ষণ কলের ঘরে বিমলের উচ্ছিষ্ট থালা বাটি ইত্যাদি মেজে পরিষ্কার করে নিচ্ছিল।

বাইরে এসে দেখল, বিমল তখনও পিতার নিকট বসে আছে।

তিনি অনর্থক পাগলামি করে তার অফিসের সময় নষ্ট করে দিচ্ছেন ভেবে গায়ত্রী রান্নাঘরের দরজা থেকে বলল, ওকে ছেড়ে দাও না বাবা! বিমলেব অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

—কার অফিস? বলে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে কন্যার মুখের পানে তাকালেন।

বললেন, বিমল ছেলেমানুষ ও অফিসের কি জানে মা? চাকরীর খাটুনী ওর কচি হাড়ে সইবে কেন? যদি বলিস, সংসার চলছে কিসে থেকে? কেন, আমার পেনসনের টাকা।

বলে তিনি পুনরায় বিমলকে উদ্দেশ করে বললেন, হাঁরে, বিমল সাহেব মাসে মাসে আমার টাকা দিচ্ছে ত?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আবার দেবে না? এণ্ডারসন যে আমার প্রাণের বন্ধু,—মাই ডিয়ার লোক। আমি কম উপকার করেছি তার!

বস্তুতঃ গত একটি বৎসর বিমল যে চাকরী করে সংসারের খরচ চালিয়ে আসছে সে কথা রত্নেশ্বর বিশ্বাস করতেন না।

তিনি জানতেন, তাঁর পেনসনের টাকা থেকেই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

তারও একটা কারণ আছে। একচল্লিশ বৎসর ধরে এণ্ডারসন কোম্পানীর অফিসে চাকরী করবার পর রত্নেশ্বরের যখন মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটল এবং তিনি একেবারেই অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন, তখন

পিতার আদেশ অনুসারে বিমল তার পিতৃবন্ধু এবং প্রভু এণ্ডারসন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করে একদা তাদের দুস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য যৎকিঞ্চিৎ মাসোহারার দাবী করল।

সাহেব স্পষ্ট জবাব দিলেন, এটা গভর্ণমেণ্টের অফিস নয়, সুতরাং এখানে কারো পেনসনের ব্যবস্থা নেই।

পরে, নিরুপায় হয়ে বিমল নিজেই তার পিতার পদে বহাল হবার জন্য সাহেবকে বহু অনুনয় বিনয় করতেও ছাড়ল না। পুরা একটি মাস হাঁটাহাঁটি করতে অবশেষে সাহেব বললেন, অনেক আগেই সেখানে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়েছে, এ সময় বরং অন্য কোন অফিসে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।

কিন্তু বিমল যেদিন তার পিতাকে এ-সব কথা শোনাল, তিনি কোন প্রকারেই তা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, অসম্ভব বিমল, তা হতে পারে না। এণ্ডারসন আমার প্রাণের বন্ধু। আমি তার যে উপকার করেছি, সে-কথা সে জীবনে ভুলতে পারবে না। মানুষে তা পারে না। পেনসন তাকে দিতেই হবে।

যাই হোক, শুধু এই সব কথা বলেই যদি রত্নেশ্বর নিরস্ত হতেন, তা হলেও বা পথ ছিল, কিন্তু সাহেবের নিকট বিমল যতই নিরাশ হয়ে ফিরতে লাগল, রত্নেশ্বরের বিকার ততই বাড়তে আরম্ভ করল।

অবশেষে বাধ্য হয়ে পিতাকে শান্ত করবার জন্য বিমলকে মিথ্যা বলতে হল। অন্য অফিসে চাকরী-করা টাকা এনে বিমল বলল, সাহেব আপনার পেনসন মঞ্জুর করেছেন।

শুনে তাঁর মস্তিষ্কের বিকার কিছু কমল, অধিকন্তু তাঁর প্রকৃত বন্ধুর উদ্দেশে অজস্র ধন্যবাদ এবং ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ বর্ষণ করে সেদিন হতে সকলের সহিত হেসে কথা কইতে আরম্ভ করলেন।

পিতার খাবারের জায়গাটা বেশ করে ধুয়ে মুছে গায়ত্রী যখন ভাতের থালাটা এনে ধরে দিল, তখন বিমলকে নিষ্কৃতি দিয়ে বললেন, যা বাপু, কোথায় যাচ্ছিস যা তুই।

ছাড়া পেয়ে বিমল জামা জুতো পরবার জন্য ঘরে ঢুকতেই গায়ত্রী চুপি-চুপি বলল, ছি, ছি, তুইও যেমন!—হ্যাঁরে, দেরি করলি, সাহেব কিছু বলবে না ত?

—না রে না। বিমল বের হয়ে গেল।

গায়ত্রীর অনাগত ভবিষ্যৎ জুড়ে যে একটা বিশাল মরুপ্রান্তর ধু-ধু করছে তা সে মাত্র এই নিরালা দুপুর বেলাটায় বেশ প্রাণে-প্রাণে অনুভব করতে পারে।

চিন্তাটাকে তত বেশী আমল না দিয়ে তাই সে কোন-কোনদিন একখানা শতচ্ছিন্ন পুরানো মহাভারত খুলে পড়তে বসে, আর কোনদিন-বা পিতার নিকট বিষ্ণুপুরাণের গল্প শুনে কাটিয়ে দেয়।

আজ খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট চুকে গেলে, তার ভিজে চুলগুলো শুকিয়ে নেবে ভেবে গায়ত্রী উঠোনের রৌদ্রে গিয়ে বসল।

আহারাদির পর, ভুলি তার বাচ্ছাগুলিকে নিয়ে ভাঙা প্রাচীরের ধারে শুয়ে আছে।

গায়ত্রী ভাবছিল, বিমলের অফিসে যেতে দেরি হয়ে গেছে! আগামী কাল তার মাইনে পাবার দিন,—কি হবে কে জানে।

এ-বয়সে বিমলের কি এই সংসারের বোঝা মাথায় নেবার কথা! না জানি তার কত কষ্টই-না হয়।

কিন্তু সেও তো কোনদিন কাকেও কিছু মুখ ফুটে বলবে না,—তার বেদনার অংশ কাকেও দিতে সে রাজী নয়। ভার—সে যত গুরুই হোক একাকী বহন করেই যেন তার আনন্দ!

গায়ত্রী তার ব্যথায় প্রলেপ দিতে চায়, তার বেদনায় হাত বুলিয়ে গায়ত্রী তাকে সম্পুর্ণ সুস্থ, নিরাময় করে দিতে প্রাণপণ চেষ্টায় সদা সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু এই দুর্জ্জেয় ভ্রাতাটির বেদনা যে বুকের তলায় কোথায় লুকিয়ে থাকে, এত করেও সে তা টের পায় না।

সম্মুখের গলি রাস্তা দিয়ে মহা সমারোহে বিবাহ-ফেরত বর-কন্যার একটা শোভাযাত্রা পার হয়ে যাচ্ছিল। দেখবার জন্য

কৌতূহল জাগতেই গায়ত্রী ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

পাশের বাড়ীর একটা কালো বিড়াল তাদের ঘরের ভিতর পাগলিনীর মত কেঁদে কেঁদে ফিরছিল। তার ছোট বাচ্ছাটি প্রায়ই ওধারের ভাঙা প্রাচীর ডিঙিয়ে গায়ত্রীর রান্নাঘরে এসে প্রবেশ করে, আর তার মা এমনি করে প্রায় প্রত্যহই কেঁদে বেড়ায়।

গায়ত্রী রান্নাঘরের শিকল খুলে দেখল, ছোট বাচ্ছাটি উনোনের ধারে মিউ মিউ করে মায়ের কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে। একমুঠো ফুলের মত গায়ত্রী তাকে বুকের উপর চেপে ধরল। তার মা তখন বিমলের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

গায়ত্রী তার কাছে বাচ্ছাটিকে নামিয়ে দিতেই, সে ছুটে এসে তাকে কোল দিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাচ্ছাটিকে মুখে তুলে নিয়ে বিড়ালটা অন্যত্র চলে গেল। সে কিন্তু সেখান থেকে নড়তে পারল না। একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিমল অফিস যাবে বলে বের হয়ে গিয়েছিল, আবার যে কোন সময় ফিরে এসেছে এবং ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করেছে গায়ত্রী সে কথা জানতে পারেনি।

ঘরে ঢুকেই বিমল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইখানে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে বলল, কি ভাবছিস দিদি?

হঠাৎ তার অতর্কিত প্রশ্নে গায়ত্রী চমকে মুখ ফেরালো। ঈষৎ হেসে বলল, তোর বৌ-এর কথা ভাবছি। —বিমল তুই বিয়ে কর।

—সেজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি নিজেই ভাবছি। বলে জামা জুতো খুলে বিমল খাটের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

—তুই যে অফিস গেলিনে বিমল?

—না।

—অসুখ-বিসুখ করেনি ত? শুয়ে পড়লি যে? বলে গায়ত্রী তার শিয়রের কাছে সরে গিয়ে মাথায় গায়ে হাত দিয়ে বলল, ও! এমনি দেরি হয়ে গেল বলে গেলিনে, নয়?—কাল ত মাইনে পাবি?

হাসতে হাসতে বিমল বলল, হ্যাঁ। কেন?

বিমলের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গায়ত্রী বলল, কাল ফেরবার সময় বাবার ওষুধ আনিস। চায়ের কেটলিটা ফুটো হয়ে গেছে, একটা কেটলিও আনবি। এদিকে রান্নার সব জিনিষই ত কিনতে হবে।

বিমল আবার হাসল। বলল, তারপর?

—এ মাসে তোর গায়ের একটা র‍্যাপার কিনে ফেল না? খদ্দরের চাদরটা ত ছিঁড়ে গেছে।

বিমল এবারেও হাসল।

গায়ত্রী একটুখানি ঝুঁকে পড়ে বলল,—না, হাসি নয় লক্ষ্মীটি, কিনো।

বিমল ঈষৎ হেসে তার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, কিন্তু এক মাস হলো আমার চাকরীটি গেছে,—তোদের বলিনি।

ভাল! বলে গায়ত্রী একেবারে নির্বাক হয়ে গেল।

দুই

পরদিন বেলা তখন দ্বি প্রহর।

আহারাদির পর বিমল কোথাও বের হয়ে যায়নি, তার ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে কি-একটা বই খুলে সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছিল। গায়ত্রী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি তার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে' ছাখ কি লিখছে।

বিমল বইখানা বন্ধ করে দিয়ে মনে মনে চিঠিখানা পড়ে ঈষৎ হাসল। পুনরায় সেখানি গায়ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সে একবার তার মুখের পানে তাকাল।

গায়ত্রী বলল, হাসছিস যে? যাবি না?—

না।

কেন? তোকে যাবার জন্যে লিখেছে যে?

কি লিখেছে আর একবার পড়ে' শোনা ত?

সেই তোর বন্ধু অমরেশ লিখেছে, নয়?

হ্যাঁ। পড়না দিদি, কি লিখেছে?

গায়ত্রী পড়ল,—

ভাই বিমল,

আবার লিখছি, একবারটি আসবি ভাই? অনেক দিন তোকে দেখিনি।

ইতি, অমরেশ।

না বিমল, তোর যাওয়া উচিত।

উচিত? বলে বিমল বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে তার টেবিলের ভাঙা ড্রয়ারখানা টেনে তার ভেতর থেকে প্রায় দশ বারোখানা চিঠি বের করে গায়ত্রীর হাতে দিয়ে বলল এগুলো সব পড়ে ছাখ।

বিমলের খাটের উপর বসে গায়ত্রী একটি একটি করে চিঠিগুলি পড়ে দেখল। প্রত্যেকটি চিঠিতেই সেই এক কথা,—একবারটি এসো ভাই।

গায়ত্রী একবার বিমলের দিকে ফিরে হাসল। বলল, অথচ, একদিনও তুই যাসনি?

না।

দুষ্টু কোথাকার! বলে গায়ত্রী আবার হাসল। বলল, আজই তুই যা বিমল।

বিমল খাটের একপাশে বসে উদাস ভাবে তার বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, আচ্ছা যাব।

না, যাব না, তুই যা।

এক্ষুনি?—এক পেয়ালা চাও খেতে দিবি নে? তিনটে তো বাজলো।

চা আমি এনে দিচ্ছি। বলে গায়ত্রী বের হয়ে গেল।

এই অবসরে বিমল তার হাতের বইখানা একবার খুলে পড়বার চেষ্টা করল কিন্তু পড়া তার হলো না।

তার মন তখন অতীত পাঠ্যাবস্থায় তারই গত জীবনের কয়েকটা অধ্যায়ের পৃষ্ঠায় ঘুরে মরছিল।

কলেজে পড়বার সময় অমরেশের সহিত তার যে কোন সূত্রে এবং কেমন করে পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল, সেকথা ঠিক তার স্মরণ নাই।

বন্ধু তার অনেক ছিল, কিন্তু একে একে সকলের সঙ্গেই তার প্রয়োজনের দিন শেষ হয়ে গেছে।

অমরেশকেও ভুলবার চেষ্টা বিমল কম করে নি। কিন্তু অমরেশ তাকে মনে করে মাঝে মাঝে যেসব চিঠি লিখেছে,—বিস্মৃতির মর্মে বসে তার প্রত্যেকটি লিপি বিমলের রক্তে দোলা দিয়ে গেছে, তবু সে তার একখানি চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় নি।

কেন দেয় নি, সে প্রশ্নের উত্তর বিমল তাব নিজেব কাছেই দিতে চায় না।

গায়ত্রী চা আনল। ইতিমধ্যে জামা জুতো পরে বিমল প্রস্তুত হয়েছিল। চা খেয়ে আজ বহুদিন পরে আবাব সেই পুবানো বন্ধুর বাড়ীব দিকে সে যাত্রা করল।

বেয়ারা বললে, বাবু ওপরে আছেন।

বিমলেব কাছে এ-বাড়ীব কোন জায়গা অপরিচিত ছিল না। একেবাবে দোতলায় উঠে গিয়ে মার্বেল-বারান্দায় সে তাব জুতো খুলে অমবেশেব ঘবে গিয়ে ঢুকলো।

কার্পেট-বিছানো মেঝেব উপব একটা সোফায় অর্ধশায়িত ভাবে অমবেশ চুপ করে কি যেন ভাবছিল।

দরজাব দিকে পেছন ফিবেছিল বলে বিমলকে সে প্রথমে দেখতে পায়নি।

বিমল তারই দিকে অগ্রসব হচ্ছিল, হঠাৎ পাশেব দেওয়ালে একখানা ছবির দিকে তার নজর পডতেই বিমল দেয়ালেব কাছে গিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে ছবিটাব দিকে তাকিয়ে বইল।

Milias-এর আঁকা একটি বন্যাব ছবি। রাত্রিব অন্ধকাবে দুবন্ত বন্যা, কোন এক দরিদ্রের কুটীবে প্রবেশ করে একটি শিশুব শয্যা ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে, কাঠের শয্যা জলেব উপর ঘুমন্ত শিশুটিকে নিয়ে ভাসছিল,—শিশুর পায়েব নীচে একটি বিড়ালের ছানা ...য়ে পড়েছে।

... আলোকে দুটি শিশুই জেগে উঠল। বিড়াল

বিমল ... শুধু জল আর জল,—পালাবাব পথ

হ্যাঁ, ব... সে কেঁদে উঠল। তার কান্নাব শব্দে

অমরেশের ... ও কাঁদবাব উপক্রম করেছিল, কিন্তু

সংসার যে কেমন

চোখ মেলে দেখল, সম্মুখে আনত নিবিড় নীলাকাশ।

ঊর্ধে তার কচিহাত ছুটি প্রসারিত করে সে এই নিস্তব্ধ নীলিমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

এমনি পরের পর ছু তিনখানি ভাল ভাল ছবি দেখে অবশেষে লর্ড লেটনের The last watch of Heron ছবিখানির উপর তাব নজর পড়তেই বিমল যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল, বলল, বাঃ! এখানা কবে আনলি অমর?

বিমলের কণ্ঠস্বরে অমরেশ সহসা চমকে ফিরে তাকাল।

তাকে চিঠি দিয়ে সে নিঃসংশয়ে স্থির করেছিল যে, বিমল আসবে না, কিন্তু আজ এমন অকস্মাৎ তার সেই সুদুর্লভ বন্ধুটি যে স্বয়ং এসে তার সে ভুল ভেঙে দেবে, অমরেশ যেন তা চোখে দেখেও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বেশ যা হোক ভাই। বলে অমরেশ উঠে দাঁড়াল। হাতে ধরে বিমলকে তাব কাছে টেনে এনে সে যে কি বলবে কিছুই খুঁজে পেল না।

অবশেষে সোফার উপর ছুজনে চেপে বসলো। অমরেশ বলল, আমাকে মনে আছে তোর? অবশ্য, সে কথা তোকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। ভাল আছিস?

বিমল বলল, হ্যাঁ।

বাবা কেমন আছেন?

বিমলের বাড়ী অমরেশ নিজে কোন দিন যায়নি, বিমলও তাকে নিয়ে যাবার জন্য কোন দিন পীড়াপীড়ি করেনি।

রত্নেশ্বরকে সে নিজের চোখে না দেখলেও বিমলের শুনেছিল যে, তিনি অসুস্থ; তাই মাঝে মাঝে দেখা হলেই অমরেশ তার পিতার কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলত না, কিন্তু রীতির মর্মে এতদিন ধরে বিমলের কাছ থেকে যে-কথা সে শুনে এ গেছে, তবু তার ব্যতিক্রম হলো না।

সে বলল, তেমনি আছেন।

এত কাছে রয়েছিস বিমল, অথচ একদিনও এদিক মাড়াস না,—আমার সময়টা কেমন করে কাটে বল ত?

বিমল তার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনও কথা বলল না।

অমরেশ বলল, অফিসে যাস্?

না।

চাকরী নেই?

না।

চলে কেমন করে?

এতদিন যেমন করে চলছিল।

বিমলের কাছ থেকে এমনি কাটা-কাটা উত্তরগুলো অমরেশের ভাল লাগত না, এবং এর জন্য উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া বিরোধ যে না বেধেছে, এমন নয়। তবু সুগভীর জলাশয়ের প্রগাঢ় গাম্ভীর্যের প্রতি মানুষের যেমন একটা আকর্ষণ থাকে, একবার তাকালে সহজে সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে পারে না,—অমরেশও তেমনি তার এই গম্ভীরপ্রকৃতি বন্ধুটির শত ঔদাসীন্য সত্ত্বেও মন হতে তাকে কোন দিন দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি, তাই সে বারে বারে জবাব না পেয়েও চিঠি দিয়েছে,—একজন মৌন হয়ে বসে থাকলেও আর-একজন কথা কয়েছে। অমরেশের মনে হতো, এই দুনিয়ায় বিমলের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ চুকবার নয়।

অমরেশ আর-একবার জিজ্ঞেস করল, সত্যি তোর চাকরী গেছে বিমল?

হ্যাঁ, বললুম ত।

অমরেশের আর কিছু বলবার প্রয়োজন হল না। বিমলের সংসার যে কেমন করে চলছে, সে বেশ বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ

চুপ করে থেকে অমরেশ অন্য কথা পাড়ল। বলল, এর মধ্যে কত ছবি এঁকে ফেলেছি, দেখবি ?

বিমল বলল, দেখি ?

আয়। বলে অমরেশ তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরখানা ছোট হলেও ছবি এবং বই দিয়ে ঘরটা সে মুড়ে ফেলেছে।

বিমল বলল, এ যে সব নূতন ছবি রে! আগে তো দেখিনি ?

অমরেশ বলল, কি করব বল ? তোকে তো পাবার জো নেই, এই নিয়েই আছি।

বেশ। বলে অমরেশের আঁকা একখানা ছবির পানে তাকিয়ে বিমল দাঁড়িয়ে রইল।

একটা টেবিলের ড্রয়ার হতে কতকগুলো ওয়াটার-কলার-পেন্টিং বের করে অমরেশ ও বিমল একটি একটি করে দেখতে আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে টেবিলের ওপর চা, রুটি ইত্যাদি রেখে গেল।

অমরেশ একটা চায়ের পেয়ালা বিমলের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো আগে খেয়ে নে। বলেই সে একবার মুখ তুলে ডাকল, বেয়ারা!

বেয়ারা চলে গিয়েছিল, তার ডাক শুনে আবার ফিরে এল।

অমরেশ জিজ্ঞেস করল, দিদিমণি এলো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এইমাত্র এলেন।

বেয়ারা চলে গেলে অমরেশ বলল, আমার দেখাদেখি নিভাও মাঝে মাঝে ছবি আঁকে। তার ছবি দেখবি ?

বলে তার নিজের আঁকা ছবিগুলোর মাঝখান থেকে একখানা ছবি টেনে বের করে বিমলের সামনে ধরে দিয়ে বলল, এটা নিভা এঁকেছে।

কিছু হয়নি। বলে বিমল সেখানা টেবিলের উপর সরিয়ে দিল।

অমরেশ ঈষৎ হেসে বলল, বাপ রে বাপ, কিছু হয়নি তার কাছে বলবার জো আছে? ভালো না হলেও আমাকে ভালো বলতে হবে।

বিমল গম্ভীর ভাবে অমরেশের ছবিগুলো ওল্টাতে লাগল।

অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর সন্ধ্যার আগেই বিমল উঠে বলল, আমি আজ আসি ভাই।

সে রবে না জেনে অমরেশ তাকে আর বৃথা অনুরোধ করল না। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বারান্দায় এসে বলল, আবার আসিস যেন বিমল, ভুলে যাসনে।

আসব। বলে বিমল তার জুতোর সন্ধানে বারান্দার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

অমরেশ বলল, কি খুঁজছিস রে? জুতো?

হ্যাঁ। কোথায় গেল? এখানেই তো খুলেছিলুম। ·

একটা চাকর পার হয়ে যাচ্ছিল, অমরেশ জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে কৈলাস, বাবুর জুতো এখানে ছিল, দেখেছিস?

কৈলাস হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে জুতো কি বাবুর? দিদিমণি বললেন, ছেঁড়া জুতো, এখান থেকে সরিয়ে নর্দমায় ফেলে দিগে যা।

হঠাৎ অমরেশ চীৎকার করে উঠল, তাই বুঝি ফেলে দিয়েছিস হতভাগা?—নিভা! বলি তোর আক্কেলটা কি রকম শুনি! বলতে বলতে অমরেশ তাড়াতাড়ি নিভার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

নিভা বলল, হ্যাঁ, আমার বুদ্ধি এমনিই। জুতোর কাদায় বারান্দার মার্বেল কি রকম হয়েছে দেখেছ?

দেখেছি, বেশ হয়েছে। কার জুতো জানিস? বিমলের।

নিভা ফিক করে হেসে ফেললে। বলল, তোমার বিমলকে বল দাদা, কাল আমি তাকে নতুন জুতো কিনে দেব।

অমরেশ বাইরে এসে ডাকল, বিমল।

কৈলাস বলল, তিনি চলে গেলেন বাবু।

খালি পায়েই? ছি ছি। বিমল! বিমল! বলে অমরেশ বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ফেরাবার জন্য ডাকতে লাগল, কিন্তু সে তখন চলে গেছে।

তিন

রাত্রি তখনও প্রভাত হয়নি।

ঈষৎ উন্মুক্ত জানালার পথে সহসা একটা বড় তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে প্রবেশ করতেই গায়ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়ীর পেছনদিকে এই জানালাটার বাইরে খানিকটা বাগানের মত জায়গা পড়ে ছিল। বহুদিনের অযত্নে সে স্থানটা এখন আগাছায় আর ঘাসে ভরে উঠেছে।

জানালাটা খুলে দিতেই গায়ত্রী দেখল, রাত্রির ঘন অন্ধকার ক্রমশঃ ধূসর হয়ে আসছে। প্রভাতের বেশী বিলম্ব নেই।

কয়েকটা ছোট-ছোট গাছের পাতা বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরছিল। রাত্রে কখন বৃষ্টি হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে নি। সেই শীত-প্রভাতে ভিজে-মাটি এবং ঘাসের গন্ধ-ভরা আর্দ্র বাতাস আবার গায়ত্রীর গায়ে এসে লাগতেই শির শির করে তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

সে শীতের শিহরণ যেন তার রক্তের সঙ্গে মিশে তাকে একেবারে উন্মনা করে দিল।

গায়ে কাপড়খানা টেনে নিয়ে জানালার একখানা কবাট ধরে গায়ত্রী দাঁড়িয়ে রইল। আবার সেই বর্ষা-বাদল!

দেখতে দেখতে গায়ত্রীর চোখের সামনে রাত্রিশেষের সে ধূসর-ঘন তিমিরাস্তরণ কেটে গেল। এলোমেলো বাতাসের সঙ্গে তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল।

ঘোলা আকাশ ধীরে-ধীরে কালো হয়ে উঠছে।

মেঘে মেঘে বাদলের আয়োজন, সমস্ত আকাশ জুড়ে আবার মহাসমারোহ ঘনিয়ে আসছে!

আকাশের গায়ে অগ্নিরেখা কেঁপে উঠল। গুরু গর্জনে মেঘ ডাকল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বাদল নামল। সেই ঘন-বর্ষণের আড়ালে সমস্ত জাগ্রত-জগৎ যেন গায়ত্রীর চোখের সামনে লুপ্ত হয়ে গেল।

অফুরন্ত জলধারার মধ্যে তৃষ্ণাদীর্ণ কণ্ঠে পান্থবিহীন পথের প্রাণান্তকারী বিজনতায় সে-ই শুধু একাকিনী দাঁড়িয়ে রইল! তার চোখের সামনে বাদলের বিষাদ-ঘোর, উতলা বাতাসের হতাশ নিশ্বাস, একসঙ্গে মিলে মিশে তারই ভাঙা বুকের উপর ভাঙা বাদ্যের মত ঝম ঝম করে বাজতে লাগল!

কাতর মিনতি-মাখা দুটি সজল চোখ তুলে ধরে গায়ত্রী এই বাক্যহীন অনন্ত বিরহীর অবিশ্রান্ত অশ্রুধারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

গায়ত্রী বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধীরে-ধীরে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানা তুলে সে বাইরে এসে দেখল, পিতা এরই মধ্যে স্নান করে ফিরছেন। বিমল হয়ত তখনও ঘুম থেকে উঠেনি।

ফুটো টিনের পথে জল ঢুকে রান্নাঘরের মেঝেটা জলে থৈ থৈ করছিল।

গায়ত্রী ঝাঁটা দিয়ে প্রথমে জলটা পরিষ্কার করে দিয়ে বিমলের দরজায় এসে ডাকল, বিমল!

দরজা খোলাই ছিল।

গায়ত্রী ভিতরে ঢুকে বলল, তোমায় একটি কাজ করতে হবে, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, এস!

মুখ হাত ধুয়ে বিমল জানালা খুলে দিয়ে চুপ করে বসে বৃষ্টি দেখছিল।

বলল, সকাল বেলা এত খোসামোদ কেন শুনি? বাজারের সময় তো এখনও হয় নি।

না থাকার নয়, এসো—তা নইলে চা খেতে পাবে না।

ও, বুঝেছি। তোমার রান্নাঘরে বান ঢুকেছে বুঝি? তা কি
াতে হবে? বলে বিমল ধীরে-ধীরে দিদির পিছু পিছু উঠে গেল।

ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে গায়ত্রী তার হাতে দিয়ে
াল, ওই ভুলির ঘরে যে ভাঙা টিনটা পড়ে আছে সেইটে এনে
ামার রান্নাঘরে তুলে দিতে হবে। পারবি তো?

ছাতা না নিয়েই বিমল উঠোনে নেমে গেল। বৃষ্টির বেগ তখন
ায় ধরে এসেছিল।

গায়ত্রী বলল, বৃষ্টিতে ভিজতে তো বলিনি! ছাতাটা নিয়ে যা।

ছাতা নিয়ে তো দেয়ালের উপর ওঠা যায় না! বলে বিমল
লির ঘর থেকে ছোট টিনের টুক্‌রোখানা এনে বলল, তোকে এটা
লে দিতে হবে কিন্তু। বলে অতি সাবধানে বিমল রান্নাঘরের দাঁত
ব-করা প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়াল।

টিনটা তার হাতে তুলে দিয়ে গায়ত্রী বলিল, দেখিস! সাবধানে
ামে আসিস যেন। বৃষ্টির জলে সব পিছোল হয়ে আছে। বলে
কদৃষ্টে বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাল করে টিনখানা ছাতের উপর বসিয়ে দিয়ে বিমল নেমে
াসতেই গায়ত্রী বলল, এবার কাপড় ছেড়ে চুপ করে বস গিয়ে,—
ামি চা দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা চা ও দুখানা বাসি পরটা টেবিলের
পর রেখে গায়ত্রী বলল, আজ বাদলের দিনে খিচুড়ি খাবি বিমল?

বেশ তো! বলে বিমল ভাঙা চেয়ারখানা সরিয়ে নিয়ে টেবিলের
াছে বসল।

গায়ত্রী তার খাটের একপ্রান্তে বসে হাসতে হাসতে বলল, তুই
াশ ছেলে যা-হোক বিমল, বলি হ্যাঁরে, নিজের পায়ের জুতো আবার
কউ ফেলে আসে? আজ এই বর্ষার দিনে খালি পায়ে হাঁটলে সর্দি
বে না?

বিমল গায়ত্রীর মুখের পানে একবার তাকিয়ে বলল, জুতো ফেলে তো আসিনি!

ফেলে আসিসনি তো কোথায় গেল? কাল যে বললি, ফেলে এলুম।

বিমল ঈষৎ হেসে বলল, শুনবি কি হয়েছিল? অমরেশের বাড়ীটা কেমন জানিস দিদি! খুব প্রকাণ্ড—সুন্দর বাড়ী! মার্বেল পাথরের বারান্দার ওপর জুতো দুটো খুলে তার ঘরে ঢুকেছিলুম,—ঘরের মেঝেটা কার্পেট দিয়ে মোড়া কিনা! তার বোন—নিভা তখন ঘরে ছিল না। আমি বেরিয়ে এসে দেখি, আমার জুতো-জোড়াটা সেখানে নেই! ভাবলুম, কেউ সরিয়ে রেখেছে। তারপর শুনলুম, মার্বেলের বারান্দার ওপর ছেঁড়া জুতো দুটো দেখে নিভা সেগুলো ফেলে দিয়েছে! এই পর্যন্ত বলে বিমল হাসতে লাগল।

কিন্তু গায়ত্রী হাসতে পারল না। তাকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বিমল বলল, কি ভাবছিস দিদি?

মুখ তুলে গায়ত্রী বলল, বাঃ! গরীবের ছেঁড়া জুতো বলে সে ফেলে দেবে?

বিমল আবার হাসল। বলল, তার সঙ্গে ঝগড়া করিস তো দ্যাখ—তাকে একদিন ডেকে আনতে পারি।

গায়ত্রী এবার হেসে ফেলে বলল, তার একটু বুদ্ধি হলো না? কচি খুকী তো নয়!

কচি খুকী কেন হতে যাবে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে।

গায়ত্রী বলল, তবে?

বিমল সেখান থেকে উঠে জানালার ভিতর দিয়ে একবার বাইরের পানে তাকাল। দিদির কাছে এসে বলল, বৃষ্টি ধরে গেছে দিদি, বাজারে কি আনতে হবে বল এবার।

মাছ আর আলু ছাড়া আর কিছু আনতে হবে না। বলে আঁচলের খুঁট থেকে একটি আধুলি বের করে গায়ত্রী তার হাতে

দিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি নেই-বা গেলি বিমল? একটু পরে যাস।

আধুলিটা নাড়তে নাড়তে বিমল বলল, আচ্ছা দিদি, সত্যি করে বল দেখি আর কদিন তুই টাকা না পেলেও চালাতে পারিস? ধর চাকরী পেতে যদি আমার দেরীই হয়।

গায়ত্রী বলল, একমাসের মধ্যে তুই চাকরী যোগাড় করতে পারবি না?

কথাটা শুনে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল, একমাস! আমি তো ভাবছিলুম আর একদিনও তুই চালাতে পারবি না।

গায়ত্রী হাসতে হাসতে বলল, হিসেব করে চালাতে পারলে চলে। তোর বৌ এলে দেখবি সে-ও এমনি চালাবে।

ঘাড় নেড়ে বিমল বলল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি দিদি তোর মত কেউ পারবে না—

না পারে শিখিয়ে নেব বিমল, বৌ তুই একটা এনেই ছাখ না।

আচ্ছা আনতে চললুম। বলে ছাতাখানি হাতে নিয়ে খালি পায়ে বিমল বের হয়ে গেল।

গায়ত্রী যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে রইল।

খানিক পরে উঠে সদরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো।

বঁটি নিয়ে কয়েকটা আলু কুটে রাখতে যাবে, এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বিমল বুঝি আবার ফিরে এসেছে ভেবে গায়ত্রী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই যার সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তাকে সে জীবনে কোনদিন দেখে নি।

সামনেই এক ভদ্রবেশী অপরিচিত যুবককে দেখে গায়ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে দরজার আড়ালে একটুখানি সরে এলো।

বিমল আছে? আমি অমরেশ।

নাম শুনে গায়ত্রী বুঝতে পারল। বলল, এইমাত্র সে বাজারে বেরিয়ে গেল, এক্ষুনি ফিরবে।

গায়ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নামল।

গলির মোড় থেকে তার গাড়ীটাকে ফিরিয়ে দিয়ে বাড়ীর নম্বর দেখতে দেখতে পায়ে হেঁটেই অমরেশ এই রাস্তাটুকু এসেছিল।

হাতে ছাতা ছিল না। সে বড় বিপদে পড়ে গেল।

গায়ত্রীও কম বিপদে পড়ে নি। জলে ভিজেই সে চলে যাচ্ছে দেখে গায়ত্রী বলল, যাবেন না, ভিতরে আসুন।

উপায়ান্তর না দেখে অমরেশ তার পিছু পিছু উঠোনটা পার হয়ে বারান্দার উপর এসে দাঁড়াল।

তারই এক কোণে রত্নেশ্বর একখানা তক্তপোষের ওপর বসে আপন মনে বিড় বিড় করে কত কথাই না বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এই অজানা আগন্তুককে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে তিনি মুখ তুলে তার পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

অমরেশ ধীরে-ধীরে একটি প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই রত্নেশ্বর বললেন, কে বাবা? বসো, বসো, চিনতে তো পারলুম না।

বলে তিনি যে কম্বলের উপর বসেছিলেন সেখানা তক্তপোষের উপর ভাল করে বিছিয়ে দেবার জন্য নিজেই উঠে দাঁড়ালেন।

অমরেশ সশব্যস্ত হয়ে তক্তপোষের একপ্রান্তে বসে বলল, না না কিছু করতে হবে না, এই ত আমি বেশ বসেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

রত্নেশ্বর কিন্তু থামলেন না, কম্বলখানা ভাল করে বিছিয়ে অমরেশকে তার ওপর চেপে বসবার ইঙ্গিত করে বললেন, এগুারসনের কাছ থেকে এসেছে? তা বেশ, বেশ,—এই বিষ্টি-বাদলার দিনে লোক না পাঠালেই পারতো সে।

একমাত্র এণ্ডারসনের কাছ হতে লোক দিয়ে তাঁর পেনসন্ পাঠানো ছাড়া তাঁর বাড়ীতে যে আর কোনও আগন্তুকের আগমন সম্ভবপর, সেটা তিনি প্রথমে ধারণা করতেই পারেন নি, কিন্তু অমরেশের কথায় তাঁর সে ভ্রান্ত সংশয় দূর হতেই তিনি কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত এবং অন্যমনা হয়ে পড়লেন।

অমরেশ বলল, আমি বিমলের বন্ধু, আমার নাম অমরেশ। আজ তাকে আমাদের বাড়ী যাবার জন্যে ডাকতে এসেছি।

রত্নেশ্বর কিয়ৎক্ষণ আপন মনে যে-কথাগুলো বলে গেলেন, অমরেশের নিকট তার প্রত্যেকটি বর্ণ দুর্বোধ্য হলেও, এই অথর্ব বৃদ্ধের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখের পানে তাকিয়ে মন তার করুণায় এত বেশী আর্দ্র হয়ে গেল যে, তার চোখ দুটো পর্যন্ত জলে ছল ছল করে উঠল।

কোন রকমে মুখ ফিরিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিয়ে অমরেশ তাঁর দিকে মুখ ফেরাতেই, সহসা তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে উঠলেন, বিমলের বন্ধু তুমি? বেশ বাবা বেশ! নামটি কি বললে?

অমরেশ।

অমরেশ,—বেশ নামটি। আমার বিমলের নামটিও বেশ। অনেক ভেবে চিন্তে নামটি রেখেছিলুম। আমার ওই এক ছেলে আর ওই এক বিধবা মেয়ে, আর কেউ নেই বাবা। দেখ, কথায় কথায় কেমন ভুলে যাচ্ছি।—বিমল। ও বিমল!

অমরেশ বলল, সে বাজারে গেছে, এক্ষুনি আসবে।

বাজার? হেঁ হেঁ তা হবে,—বাজারেই গেছে তাহলে। এক্ষুনি ফিরবে সে, বসো তুমি বসো। দু একদিন আমিও যাই বাজারে, তবে কিনা আমার কাছে নাকি পয়সা-টয়সার গোলমাল হয়ে যায় তাই গায়ত্রী আমাকে আর যেতে দেয় না। সেই সেদিন কি করে ফেলেছিলুম পরেশকে একবার শুনিয়ে দে তো মা!

এই বলে তিনি হাসতে হাসতে মুখ তুলে দেখলেন গায়ত্রী

সেখান থেকে চলে গেছে। বললেন, যাক্, তোমার বাবা কি করেন পরেশ ?

অমরেশ ধীরে-ধীরে বলল, আমার নাম অমরেশ। বাবা মা আমার কেউ নেই। আমি—আর আমার দুটি বোন আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমরেশ, অমরেশ, আর ভুলব না। কি বললে ? বাবা মা কেউ নেই ?

অমরেশ ঘাড় নেড়ে বলল, না।

আঃ, ছি-ছি, ছি-ছি, যাকে জিজ্ঞেস করি, হয় বাবা নেই, নয় মা নেই। এমনি সব। প্রাক্তন, এ-সব কর্মফল,—আর কি বলব বাবা, এই যে আমার ছেলে মেয়ে দুটো, মায়ের ভালোবাসা পেলে না,—বাবা বেচে রয়েছে। মাত্র জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকা তা আমার মতন বাপ, বেঁচে থাকলেই-বা কি, আর না থাকলেই বা কি !

বলতে বলতে তাঁর ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে টস টস করে দু ফোঁটা অশ্রু তাঁর কম্পিত হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

তিনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে আপন মনেই বকতে লাগলেন।

এমন সময় কাদা-পায়ে বাজার থেকে ফিরে এসে বিমল রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই গায়ত্রী বলল, অমরেশ এসেছে।

কোথায় ?

গায়ত্রী বলল, দেখতে পাচ্চিস না, ওই যে বাবার কাছে বসে।

ছাতাটা বন্ধ করে বিমল ঘরের বারান্দার দিকে মুখ ফেরাতেই অমরেশের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

চার

এই মেঘলা-শীত-শীত দিনটা যে কেমন করে কাটবে নিভা তাই ভাবছিল।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করল, বিভাকে সঙ্গে নিয়ে আজ দুপুর বেলাটা কোনো এক বন্ধুর বাড়ীতে কাটিয়ে আসবে।

বিভা জানালার ধারে বসে তার একটা রঙিন জামা কাঁচি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটছিল।

একটি কাজ কর ত' ভাই বিভা।

বলে নিভা তাকে কি একটা কথা বলবার জন্য অগ্রসর হতেই নতুন জামাটার দুরবস্থা দেখে সে বলে উঠল, সকাল বেলা আজ আবার মাথায় এ কি ঝোঁক চেপেছে তোর? জামাটা কেটে ফেললি যে হতভাগী?

কাটবো না ত সারাদিন তোমার পায়ে কত তেল দেব দিদি! মেয়ের খান-দুই জামা আজ কদিন থেকে চাইছি বল ত?—মুখ না তুলেই গম্ভীর ভাবে এই কথা কটা বলে বিভা আপন মনে পুনরায় কাঁচি চালাতে লাগল।

নিভা হো হো করে হেসে উঠল; বলল, নিজের ভালো জামা কেটে পুতুলের জামা তৈরী করতে হয়, এ বিদ্যে তোকে কে শেখালে?

বিভা এবার মুখ তুলে বলল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে,—আর মোটে তিনটি দিন বাকী, জানো?

নিভা আর একবার হাসল। বলল, দূর পোড়ারমুখী, পোষ মাসে কি বিয়ে হয়? এটা যে পোষ মাস?

বিভা ঘাড় নেড়ে বলল, হয় হয়,—তুমি জান না। মেয়ে বড় হয়েছে, আর রাখা যায় না।

আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হল, কিন্তু আজ দুপুরে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি ত?

হ্যাঁ যাব। বলে কয়েকটা কাপড়ের মাঝখানে পুতুলের মাথা গলাবার মত একটি ছোট ছিদ্র করে বিভা বলল, দেখ না দিদি কতগুলো হ'ল—এই ধর, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত,—

থাক, অনেক হয়েছে, আর গুনতে হবে না। বলে কাপড়ের টুকরোগুলো নিভা তার কোলের উপর ফেলে দিয়ে ডাকল, বেয়ারা!

দরজার বাইরে কৈলাস এসে দাঁড়াতেই নিভা বলল, ঠাকুরকে বল কৈলাস, আজ যেন সাড়ে-দশটার মধ্যে আমাদের খাবার দিয়ে যায়, আমরা বেড়াতে বেরবো।

কৈলাস চলে গেল এবং অনতিকাল পরে ফিরে এসে জানাল যে, উনোনে আগুন দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও ভাত চড়ানো হয় নি। দাদাবাবুর কে-এক বন্ধু নাকি আজ এখানে আহার করবেন, পোলাও রান্না হবে, ঠাকুর বাজারে গেছে এবং ফিরতে হয়ত তার একটুখানি দেরিও হতে পারে।

দাদাবাবুর বন্ধুটি যে কে, এবং কিসের জন্য আজ তার এখানে নিমন্ত্রণ, সে কথা বুঝতে নিভার দেরি হলো না, এবং এই চিন্তার সূত্র ধরে জুতো ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটাও তার মনে পড়ে গেল।

বলল, অত-সব জানিনে বাপু। শোন কৈলাস, সাড়ে-দশটার সময় ভাত আমার চাই-ই। তা নইলে কিছু বাকি রাখব না বলে দিচ্ছি।

কৈলাস ভয়ে-ভয়ে নীচে নেমে গেল।

নিভা বলল, ও-সব রাখ বিভা, চান করবি তো আয় আমার সঙ্গে।

বিভা তার দিদির মুখের পানে তাকিয়ে বলল, চান? বাবাঃ, যে শীত! আমি পারবো না দিদি, তুমি যাও।

নিভা আর কোন কথা না বলে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল।

স্নান যখন তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বিভা বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, দিদিমণি!

স্নানের ঘরের ভেতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বিভা বন্ধ দরজার উপর বারকতক আওয়াজ করে বলল, এস দিদিমণি, দাদা ডাকছে, শীগগির বেরিয়ে এসো।

একটা বড় আর্সির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিভা লোসন দিয়ে তার চুলগুলো ঝেড়ে নিচ্ছিল বাঁ-হাত দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিল।

বিভা ঘরে ঢুকে বলল, দাদা ডাকছে কতক্ষণ থেকে শুনতে পাচ্ছো না?—বাঃ, তোমার এটার তো বেশ গন্ধ। আমার চুলেও একটু দাও না দিদি!

তার মাথার ওপর খানিকটা লোসন ঢেলে দিয়ে নিভা বলল, তখন ডাকলুম এলিনে যে?—দাদা আমাকে কি জন্যে ডাকছে রে বিভা?

বিভা বলল, তা আমি কেমন করে জানবো? তুমি এসো, আমি চললুম। বলে বিভা চলে যাচ্ছিল, নিভা তাকে আবার ডেকে জিজ্ঞেস করল, দাদা একা রয়েছে?

না, সেই বিমলদা এসেছে।

সে তোর দাদা হয় বুঝি? বলতে বলতে সোনার একটা ব্রুচ দিয়ে নিভা তার শাড়ীর আঁচলটা আটকে নিচ্ছিল, ব্রুচের ছুঁচলো ডগাটা হঠাৎ তার আঙ্গুলের মাথায় ফুটে যেতেই উঃ বলে ব্রুচটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আর পারিনে বাবা,—যা বলগে যা, সে এলো না।

বেশ, তাই বলিগে। বলে বিভা বের হয়ে গেল।

ইচ্ছা সত্ত্বেও নিভা তাকে আর ডেকে ফেরাতে পারল না।

সুমুখে আর্সির ওপর তার নিজের চেহারার দিকে একদৃষ্টে সে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল এবং এক সময় অন্যমনস্কের মত

ব্রুচটি কুড়িয়ে নিয়ে শাড়ীর আঁচলে আটকে নিয়ে ধীরে ধীরে অমরেশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

সোফাব এক পাশে বিমল বসেছিল, তার কোলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বিভা একখানা ছবির বই ওল্টাচ্ছে।

সহসা দিদিকে ঢুকতে দেখে বলে উঠল, কেমন, আসতে হল কিনা?

নিভা যেন একটুখানি লজ্জিত হয়ে পড়ল। বিমল একবার মুখ তুলেই আবাব তক্ষুনি চোখটা নামিয়ে নিয়ে বই-এর একখানা ছবিব দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বইল।

অমবেশ বলল, ওরে নিভা, আজ আবাব তুই কোথায় যাবি বলেছিস?

নিভা দেখল, দবজাব পাশে তাদের পাচক-ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ হাত জোড় কবে দাঁড়িয়ে আছে।

এ কাজ যে তারই, সে সম্বন্ধে তাব আর কোন সংশয় রইল না।

নিভা একবার তার দিকে তাকিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বলল, আসতে না-আসতেই নালিশ করেছ বুঝি?

বিশ্বনাথ ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অমরেশ বলল, না রে না, ওকে কিছু বলিস নে। সাড়ে দশটাব সময় ভাত ও দিতে পারবে না,—তোরও কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিভা ঠাকুরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

অমরেশ বলল, যাও বিশ্বনাথ, তুমি যাও। নিভা যদি আজ ঠাকুরকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে না দিস, তাহলে রান্না যা করবে তা তো আর মুখে দেওয়া যাবে না।

যা করে করুক, তাই বলে আমি আর রান্নাঘরে যেতে পারবো না দাদা। বলে নিভা বসতে যাচ্ছিল হঠাৎ সুমুখের আয়নাটার

দিকে তার দৃষ্টি পড়তেই সকলের অলক্ষ্যে প্রথমে সে তার নিজের মুখখানা একবার ভাল করে দেখে নিল।

আয়নার ভিতরে বিভাকে আর বিমলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, বিমলের খালি পা দুটোর দিকে হঠাৎ তার নজর পড়তেই নিভা কিছুতেই তার হাসি সামলাতে পারল না।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে হাসছিল, কিন্তু অমরেশের কাছে তার সে-হাসি ধরা পড়ে গেল।

অমরেশ বলল, হাসছিস যে?

মুখে কোন কথা না বলে বিমলের পা-দুটোর দিকে নিভা তার আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

অমরেশও আঙুল বাড়িয়ে ঘরের কোণের দিকে কার্পেটের ওপর একজোড়া নতুন জুতো দেখিয়ে দিয়ে বলল, আর এগুলো কি?

কিনেছেন বুঝি?

কিনবে না? তুমি কি কম বজ্জাত!

নিভা বলল, হ্যাঁ! তা বই কি! আমার মার্বেলের চেয়ে ওঁর একজোড়া জুতোর দাম বেশি নয়, তা জানো?

কথাটা তারই উদ্দেশে বলা হচ্ছে ভেবে বিমল একবার মুখ তুলে তাকালে মাত্র. কিন্তু তক্ষুনি তাকে আবার বই-এর পাতায় মনোনিবেশ করতে দেখে নিভার আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল।

কিন্তু এমনভাবে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

সেখান হতে উঠে যাবার জন্য নিভা ডাকল, বিভা!

বিমল তখন বিভাকে কি-একটা ছবির মানে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। দিদির ডাকে একবারমাত্র সাড়া দিয়ে বিভা আবার বিমলের কথাগুলো শুনতে লাগল।

বিমল বোধকরি নিভার কথা শুনতে পায় নি, তাই সে-ও থামলো না।

নিভার রাগ আরও বেড়ে গেল। সে আবার ডাকল, বিভা!

বিমল বিপরীত দিকে মুখ রেখেই বলল, যাও না, দিদি কি বলছে শুনে এসো।

কথাটা অগ্রাহ্য করে বিভা বলল, না, তারপর কি হল বল।

নিভা বলল, আমি বলে দিচ্ছি আয়, উনি জানেন না।

দিদির মুখের পানে ফিরে তাকিয়ে বিভা বলল, হ্যাঁ, বিমলদাদার চেয়ে তুমি বুঝি বেশি জানো?—তুমি ওঁর চেয়ে বেশি পড়েছ?

বই পড়া আর ছবি বোঝা এক নয়। আয়—

অমরেশ বুঝল, নিভার ছবিখানার ওপর গতকাল বিমল যে মন্তব্য প্রকাশ করেছে এটা তারই পালটা জবাব।

বলল, শুনেছিস বিমল, আমি না কাল তোকে বলেছিলুম, ওর আঁকা ছবি খারাপ হলেও ভাল বলতে হবে।

বিমল মুখে কিছু বলল না, নিভার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না, অমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে একটুখানি হাসল মাত্র।

মুখে কিছু বললেও-বা কোন রকমে এ বিতর্কের মীমাংসা হয়ে যেতে পারত, কিন্তু তার দিকে লক্ষ্য মাত্র না করে অপরের মুখের পানে তাকিয়ে এই যে একটুখানি অবহেলার হাসি, নিভার বুকে বড় নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

হঠাৎ এই সামান্য কারণেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। দুর্জয় অভিমানে তার বুকের ভেতরটা গুর গুর করে কাঁপতে লাগল।

কোন মতে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে নিভা খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

অমরেশ বলল, যাচ্ছিস কেন নিভা, তার চেয়ে একটা গান গা, শুনি।

'এর পর শুনো। বলে নিভা চলে যাচ্ছিল, অমরেশ বলল, তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই নিভা, সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

কি একটা অপ্রিয় শক্ত কথা নিভার ঠোঁট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছিল; কিন্তু যার উদ্দেশে সে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হতেছিল, সেই নিরীহ বিমলের শান্ত সুন্দর মুখের অচঞ্চল গাম্ভীর্য এবং ঔদাসীন্যের

দিকে তার দৃষ্টি পড়তেই সন্ধানী শর তার ধনুকের ছিলাতেই আটকে রইল,—নিক্ষেপ করতে সাহস হলোনা।

না জানি পাষাণে নিক্ষিপ্ত এই শর হয়ত ফিরে এসে তারই বক্ষ ভেদ করে বসবে।...আর কোনদিকে না তাকিয়ে নিভা নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং দুড় দুড় করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নীচের রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

রান্নাঘরের পাশে যে ঘরটা ছিল সেখানে বসে বিশ্বনাথ তখন গাঁজার কলকেয় আগুন চড়িয়ে সবেমাত্র একটি দম দিয়েছে এবং কৈলাস হাত বাড়িয়ে কলকেটা নিতে যাচ্ছে, এমন সময় নিভার চটি জুতোর শব্দ শুনে দু'জনেই চমকে উঠল।

বিশ্বনাথের বুকের ভেতর পট পট করে অতি দ্রুত তালে সেই জুতোর শব্দের যেন প্রতিধ্বনি হতে লাগল, কোন রকমে হাতের কলকেটা ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চল পাথরের মত সে বসে রইল। তার গলার ভিতরটা পর্য্যন্ত নিমেষেই যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

কৈলাস তাড়াতাড়ি নিভার কাছে এসে বলল, আপনি আবার কেন নীচে নেমে এলেন দিদিমণি, বিশ্বনাথ সব ঠিক করে ফেলেছে—আর আধ ঘণ্টা-খানেক।

নিভা বলল, না, আর এক মিনিট নয়,—যেমন হয়েছে আমায় তাই দিতে বল, ঠাকুর কোথায়?

নিভা যে তাদের অপকর্মটা দেখতে পায়নি, শুধু খাবারের জন্য নীচে নেমে এসেছে, এই জেনে কৈলাস যেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠল এবং চীৎকার করে বিশ্বনাথকে ডেকে বলল, যেমন হয়েছে তেমনি দাও।

বিশ্বনাথও আর দ্বিরুক্তি না করে থালা বাটি টেনে নিয়ে সাজাতে সুরু করছিল, নিভা তাকে নিষেধ করে বলল, এখন খাব না। একটু একটু করে দাও কেমন রান্না হয়েছে দেখি।

মাংস মুখে দিয়েই নিভা চীৎকার করে উঠল, জল ! জল ! ছি ছি, একি করেছ ঠাকুর ! যা ভেবেছি তাই !

নিভা আর কথা বলতে পারল না, দর দর করে তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে উঃ ! আঃ ! করতে করতে সে রান্নাঘরে ফিরে এলো।

বলল, বিশ্বনাথ যাও তুমি, অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখগে বাপু, এখানে আর চলবে না। বাড়ীতে একটা ভদ্রলোক এসেছে, এ রান্না মুখে দেবে কেমন করে বলত ?—কি চড়িয়েছ ?

অতি কষ্টে বিশ্বনাথ উত্তর দিল, পোলাও।

সর, তুমি আর হাত দিও না। বলে নিভা উনোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে-ভয়ে বিশ্বনাথ সরে গেল।

নিভা ডাকল, কৈলাস ! যাও তুমি বাজার থেকে আবার মাংস নিয়ে এসো—এত ঝাল কেউ সহ্য করতে পারে না। উঃ !

কৈলাস বাজারে চলে গেল। বিশ্বনাথ আমতা-আমতা করে বলল, আপনি পারবেন না দিদি-ঠাকরুণ—আমাকে ছেড়ে দিন।

নিভা রেগে উত্তর দিল, আর কথা বলো না ঠাকুর, সরে পড় মেয়েরা আর-কিছু পারুক আর না পারুক, অন্তত রাঁধতে পারে।—তোমার মাইনে বাকী আছে ?

বিশ্বনাথ ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল যে, মাইনে তার বাকী নেই।

নিভা বলল, আজ খেয়ে-দেয়ে তুমি চলে যাও, তোমাকে আমি জবাব দিলুম। দাদার কাছে গিয়ে কাঁদলে পাবে না বলে দিচ্ছি তাহলে আমি কিছু বাকী রাখব না—অপমান করে তাড়িয়ে দেব।

এখানের অন্নজল বিশ্বনাথের আজ থেকে উঠে গেল তা সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেও ধীরে-ধীরে সরে দাঁড়াল।

খাবার সময় বিশ্বনাথের পরিবর্তে নিভাকে পরিবেশন করতে দেখে গর্বে এবং আনন্দে অমরেশের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, তবে যে তখন বললি পারব না? দেখ দেখি কেমন মানিয়েছে,—এই ত চাই!

কথাটা শুনে বিমলও একবার মুখ তুলে নিভার মুখের দিকে তাকাল।

তার সে নিঃসঙ্কোচ এবং নির্ভীক দৃষ্টির মধ্যে কোন অর্থই ছিল না, তবু নিভা তা লক্ষ্য করতেই তার কর্ণমূল থেকে গাল পর্যন্ত হঠাৎ হিঙুলের মত রাঙা হয়ে উঠল।

পেরেছি কি সাধে? দেখবে তবে? বলে নিভা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বিশ্বনাথের রাঁধা এক বাটি মাংস এনে অমরেশের থালার কাছে ধরে দিয়ে বলল, খাও তো দেখি!

খানিকটা মাংস মুখে দিয়ে অমরেশ বলে উঠল, এই বুঝি সে রান্না করেছিল? উঃ বলি, হাঁ হে বিশ্বনাথ, বাজারে আজ লঙ্কা কি আর আছে, না সব এতেই দিয়েছ?

কথাটা শুনে নিভা হেসে একবার বিমলের মুখের পানে তাকাল। সে তখন মাথা হেঁট করে আপনমনেই খেয়ে চলেছে। নিভার সে সলজ্জ মুখের হাসিটুকু দেখতে পেল না।

ওদিকে তখন বিভা তার পুতুলকে জামা পরাচ্ছে। নিভা বলল, এ সময় পুতুল নিয়ে বসলি কেন বিভা, খেতে হবে না?

বিভা বলল, দাঁড়াও না দিদি, আর এই একটা হলেই হয়ে যাবে।

বাবাঃ! মেজাজ দেখলে কি হয়! বলে বিমলের দিকে আর একবার কটাক্ষ হেনে নিভা দ্রুতপদে চলে গেল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাকে উদ্দেশ করে কথাটা বলা হল, সে মানুষটি যেমন নতমুখে বসে খেয়ে চলেছিল, তেমনি বসে বসে খেতেই লাগল, একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখল না।

কিছুক্ষণ পরে বিভা নীচে নেমে এলো। বলল, আমাকে এবার দাও দিদি, খুব খিদে পেয়েছে।

পাবে না?—বেলাও তো কম হয়নি। বলে রান্নাঘরের এক

কোণে তাকে খেতে দিয়ে নিভা তার সামনে বসে গল্প করতে লাগল।

বিভা বলল, তুমি খেতে বসলে না যে দিদিমণি?

খাবে কি, নিভার মনে তখন রঙের আমেজ! পেটের খিদে তার নেই বললেই হয়। তখন সে তার মনের খিদে মেটাবার জন্যে ব্যস্ত।

একটুখানি হাসলে নিভা। বললে, দাঁড়া, আগে সবাইকে খাওয়াই, তবে তো খাবো। দাদার ওই অসভ্য বন্ধুটি আমাকে রাঁধুনি বানিয়ে ছেড়েছে

বিভা মুখ তুলে বলল, অসভ্য বলছো কেন দিদি? বিমলদা অসভ্য?

—অসভ্য না তো কী? অসভ্য না হোক্, অভদ্র তো নিশ্চয়ই। কথা বললে কথা বোঝে না মুখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। গোমরা মুখ করে বসে থাকে।

এর বেশি কোনও কথা সে বিভার কাছে বলতে পারে না। ছোট বোনের কাছে বলতে লজ্জা হয়। তাই সে কথাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। বলে, আচ্ছা বিভা, এই শাড়ীটা পরলে সত্যি বল তো—আমাকে কি খুব কুচ্ছিত দেখায়?

—সে কি দিদি কুচ্ছিত কি বলছো, এই শাড়ীটা পরলে তোমাকে এত ভাল মানায়—সে আর কী বলবো। আমার এক-একদিন লোভ হয় তোমার এই শাড়ীটা চেয়ে নিয়ে পরি।

নিভা বলল, এ-শাড়ীটা তোকে আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা বল তো দেখি, তখন সেই চান করে তোদের ওখানে যখন গেলুম—তখন আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল না এখন দেখাচ্ছে?

বিভা বলল, সেই তখন। চুলগুলো তখন মাথার ওপর তুলে বেঁধেছিলে কিনা তাই—

নিভা বলল, দুর পাগলী। তুই কাণা, তোর চোখ নেই

বিভা বলল, না না সত্যি বলছি দিদি, তখন তোমাকে কেমন বোষ্টমী-বোষ্টমী দেখাচ্ছিল। ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে।

—যাঃ, বোষ্টমীরা দেখতে বুঝি খুব সুন্দর? তুই কিচ্ছু জানিস নে।

কিন্তু পরাভব স্বীকার করতে বিভা রাজি নয়, বলল, চল, দাদাকে জিজ্ঞেস করবে।

মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিভা বলল, কোন দাদাকে? আমাদের দাদা, না তোর সেই কাটখোট্টা বিমলদাদাকে জিজ্ঞেস করবি?

বিমলের কাঠখোট্টা অপবাদে বিভা যেন একটুখানি অসন্তুষ্ট হলো। বলল, হ্যাঁ! বিমলদাদা বুঝি কাঠখোট্টা?

নয় ত কি? বলে নিভা এমনভাবে হাসতে লাগল যে বিভাও বুঝতে পারলে ওটা তাঁর মনের কথা নয়

কাউকে কোনও কথাই জিজ্ঞেস করতে যাওয়া হলো না।

আসলে নিভা চাইছিল, বিভা বলুক্ যে—এখনই তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। বিমল যখন উপস্থিত ছিল না তখন তাকে বৈষ্ণবীই দেখাক আর যাই দেখাক, তাতে তার কিছু এসে যায় না।

সারাটা দিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল। অপরাহ্নের দিকে বৃষ্টি ধরে এলো এবং একটুখানি স্নিগ্ধ রৌদ্রের আভাস ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে বারান্দায় এসে পড়ল।

আজ এই বাদলের দিনে নিভার মনটাও খামোখা যেন ভিজে ভারি হয়ে উঠেছিল; এতক্ষণে মেঘাবরণমুক্ত সূর্যের এই প্রসন্ন দৃষ্টির সাক্ষাৎলাভ করে তার মনের ওপর থেকে যেন একটা মেঘের সূক্ষ্ম পর্দা সরে গেল।

মনে পড়তে লাগলো আজ সারা দিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলির কথা। নিভা দেখল, আজ একটা লোককে সে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়ে বসেছে।

বিশ্বনাথকে যেন না তাড়ালেই ভাল হতো। তক্ষুনি কৈলাসকে ডেকে নিভা জিজ্ঞেস করল, বিশ্বনাথ চলে গেছে ?

কৈলাস বলল, হ্যাঁ দিদিমণি, বিমলবাবুর সঙ্গে সে এইমাত্র চলে গেল।

অবাক হয়ে গেল নিভা। বলল, বিমলবাবুর সঙ্গে ? কেন, তাঁর সঙ্গে কেন ?

কৈলাস তাকে বুঝিয়ে বলল, গরীব লোক দিদিমণি, আজকালকার বাজারে চাকরী পাওয়া তো সোজা নয়। তাই বিমলবাবু যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তাঁর হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বললে,—আপনি যদি দিদিমণিকে একবার বলে দেন বাবু, তাহলে আমার চাকরীটি থাকে।

তাই না শুনে বিমলবাবু বললেন—[illegible]তা আমি পারব না বাপু, তবে তুমি আমার সঙ্গে এসো, দেখে-শুনে তোমার একটা চাকরী আমি যোগাড় করে দিতে পারি।

কথাগুলো শুনে নিভা যেন দপ করে জ্বলে উঠল।

বলল, দেখ কৈলাস, তোমাদের আমি এখন থেকে বলে রাখছি, ফের যদি বিশ্বনাথ আমাদের বাড়ী ঢোকে, তাহলে ঐ সদর দরজা থেকে তাকে দূর করে দিও। তা না হলে বুঝতেই পারছ, তোমাদের কারও চাকরী থাকবে না।

কিন্তু কিছুই সে বুঝতে পারল না। দিদিমণির মনের মধ্যে তখন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। সামান্য চাকর সে। সে কি বুঝবে ?

নিভা আবার বলল, আমাকে বললে বুঝি তার মান যেতো। আমার বাড়ীর একজন অতিথি, তিনি কি ভাবলেন বল তো ? ছি।

এই বলে সে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর কাগজ-পত্রগুলো বিনা কারণেই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কৈলাস ভয়ে ভয়ে সরে পড়লো সেখান থেকে।

সে চলে গেলে নিভা উদাস দৃষ্টিতে একবার বাইরের দিকে তাকালো।

দেখল, তাদের কথা কইবার অবসরে কোথা থেকে এক খণ্ড মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে এবং সুমুখের বারান্দার ওপর থেকে তার সামান্য রশ্মিটুকুও কোন সময় অপসারিত হয়ে গেছে।

পাঁচ

দিন-দুই পরে, সেদিন অপরাহ্ণ-বেলায় বিভা তার ছেলেমেয়ে-গুলিকে নূতন পোষাক পরিয়ে একটি ছোট টিনের বাক্সের মধ্যে ধীরে-ধীরে শুইয়ে রাখছিল। বেড়াতে যাবে বলে গাড়ী আনবার হুকুম দিয়ে নিভা সেই ঘরের খোলা জানলাটার পাশে গিয়ে চুপ করে বসল।

বিভা বলল, আজ ত গায়ে-হলুদ হয়ে গেল দিদি, কাল আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি তাকে কি দেবে বল। একটা গয়না দিও, কেমন?

আচ্ছা, তাই দেব। তুই আমার সঙ্গে যাবি ত ওদের তুলে রাখ—গাড়ী আনতে বলেছি।

বিভা কি-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, নিভা হঠাৎ ডেকে উঠলো, কৈলাস—

অমরেশের ঘর থেকে কৈলাস উত্তর দিল, যাই দিদিমণি।

কৈলাস কাছে এসে দাঁড়াতেই নিভা বলল, চাকরী পথে-ঘাটে পড়ে থাকে না কৈলাস। ওই দেখ, বিশ্বনাথ আবার ফিরে আসছে।—এই বলে নিভা রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তাকে দেখিয়ে দিল।

কিন্তু কৈলাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে রাস্তা পর্যন্ত নজর চলছিল না, তবু সে বলে উঠল, সে কথা ত আগেই বলেছি দিদিমণি, আজকালকার বাজার—

নিভা বলল, আচ্ছা যাও, বিশ্বনাথকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও-গে। এখানে ছাড়া তার গতি নেই, তা আমি জানি।

কৈলাস নীচে নেমে গেল এবং পরক্ষণেই বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

নিভা বলল, বাবু নিজের একটা চাকরী জোটাতে পারে না, এই ত মুরোদ,—সে দেবে তোমার চাকরী জুটিয়ে! কেন মিছে তার খোসামুদি করতে গেলে ঠাকুর?—যাও আর কখখনো ও-রকম খারাপ রান্না করো না।

বিশ্বনাথ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, নিভার কথাগুলো ভাল বুঝতে না পেরে বোধকরি সে একবার কৈলাসের মুখের দিকে তাকাল।

কৈলাস হাসতে হাসতে তাকে বুঝিয়ে দিল, দিদিমণির রাগ ত তুমি জানো বিশ্বনাথ, তবে তুমি কেন চলে গেলে?

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারল বিশ্বনাথ। বলল, আমার কাজ ত বিমলবাবু করে দিয়েছেন; আমি তো আজ দুদিন সেখানেই রাঁধছি দিদিমণি।

কথাটা শুনে নিভা যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু অন্তরের সে ভাবটা বাইরে গোপন করে সে বলে উঠল, তবে কি জন্যে মরতে এসেছ এখানে? কৈলাসের সঙ্গে গাঁজা টানতে?

কৈলাস লজ্জায় মরে গেল।

বিশ্বনাথ বলল, না দিদিমণি, এখানে আমার একখানা ধুতি ফেলে গেছি, সেইটে নিতে এসেছি।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, নিভা তাকে বলতে দিল না। বলল, বেরোও এখান থেকে—আর কোনদিন এ-বাড়ীর দরজা মাড়িয়ো না।

সিঁড়ি দিয়ে তারা নেমে যাচ্ছিল, সহসা নিভার ডাক শুনে বিশ্বনাথ ভয়ে-ভয়ে পিছন ফিরে বলল, আমায় ডাকছেন দিদিমণি?

হ্যাঁ ডাকছি, শোন।

বিশ্বনাথ দরজার চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। নিভা বলল, ভেতরে পেরিয়ে এসো।

সে তার কাছে এসে দাঁড়াতেই নিভা জিজ্ঞেস করল, বিমলবাবু কি সেই রাত্রেই তোমার চাকরী করে দিলেন?

না দিদিমণি, সে-রাত্রে আমি তাঁর বাড়ীতেই ছিলুম, তার পরের দিন সকালে একটা মেসে আমাকে রেখে দিয়ে এলেন।

নিভা একটুখানি চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, তাঁর বাড়ীতে ছিলে? বাড়ী ঘর-দোর কেমন? থাকবার জায়গা ছিল ত?

বিশ্বনাথ বলল, ওঁরা বড় গরীব দিদিমণি। কিন্তু আহা, বুড়ো বাপটিও তাঁর যেমন ভাল মানুষ—দিদিটিও তেমনি। আমাকে যে কোথায় রাখবেন, কি খেতে দেবেন, এই নিয়ে তাঁরা সবাই মিলে একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠলেন।

একটু থেমে সে আবার বলল, বিমলবাবুর বাবাকে দেখলে, তাঁর কথাবার্তা শুনলে সব ভুলে যেতে হয় দিদিমণি! তিনি ত আমাকে নিজের শোবার বিছানাটাই ছেড়ে দিতে চাইলেন। আমি বললাম, সে কি কথা বাবা, আমি যে ভাত রেঁধে খাই—রাঁধুনী বামুন! তিনি কিছুতেই শুনবেন না, বলতে লাগলেন, অতিথি যে-জাতিই হোক, তার সেবাই আমাদের ধর্ম।

অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে পুরাণের গল্প, মহাভারত, এই সব পড়ে শোনালেন। তাঁর একটু মাথা গরমের ছিট আছে বলে মনে হলো, কিন্তু এমন মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি দিদিমণি!

নিভা বলল, দেখনি বেশ করেছ, কিন্তু আমি যে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, বিমলবাবু তাঁর বাড়ীতে কি সে-কথাও বললেন নাকি?

কই না, সে-কথা ত বলতে শুনিনি। আর তাড়ানোর কথা কেন বলছেন দিদিমণি? দোষ-অপরাধ করলে মনিবে রাগ করে দুটো কথা বলে না ত কে বলে? আপনার কাছে যেমন সুখে ছিলাম, তেমন কি আর-কোথাও থাকবো, না তেমন কপাল আর হবে? আমিও তাই আপনার কথাই সেদিন পরিচয় দিচ্ছিলাম বিমলবাবুকে।

এই মরেছে! নিভা ফিক করে একটু হেসে ফেললো। আমার কথা কি পরিচয় দিচ্ছিলে মরতে?

বিশ্বনাথ বলল, সে আর কত বলবো দিদিমণি? আপনার গাল-মন্দ যেমন খেয়েছি, আদর-যত্নও তেমনি পেয়েছি। সেই সেদিনের কথাটাই বলছিলাম। বলি, এমনটি কে করে বলুন তো বিমলবাবু? —কোথাকার কোন এক রাঁধুনি বামুন, শীতের রাতে ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে পড়লে কোন মুনিব নিজের গায়ের দামী আলোয়ান তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আসে? আপনার সে-কাজটি ত মরে গেলেও ভুলতে পারবো না দিদিমণি!

তাই বুঝি বিমলবাবুর কাছে বলা হয়েছে?

শুধু বিমলবাবু কেন দিদি, সে-কথা যে আমি সবাইকার কাছে বলে বেড়াই।

মুখে না বললেও নিভা যেন খুশী হলো মনে মনে। বললে—আচ্ছা যাও। চাকরী গেলে আবার এসো।

বললেও আসব, না বললেও আসবো। বলে খুশী-মনে হাসতে হাসতে বিশ্বনাথ চলে গেল।

গাড়ীর ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকিয়ে নিভা দেখল, দরজায় তাদের গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে।

বিভাকে বলল, আয় বিভা, গাড়ী এসেছে। বলেই তাকে সে আবার জিজ্ঞেস করল, হাঁ রে বিভা, কাল তোর মেয়ের বিয়ে, কাউকে খেতে বলবি নে?

কথাটা তার মনে ছিল না। হ্যাঁ, বলবো, বলবো—বলে বিভা মুখ তুলে দিদির মুখের দিকে তাকাল।

কাকে বলবি?

এইবার সে বিপদে পড়ল। কাকে বলবে না-বলবে তা তো সে জানে না! নিভাকে সে ঠিক সেই প্রশ্নই করে বসল। বলল, তুমিই বলে দাও না দিদি, কাকে কাকে বলবো?

হাসি-হাসি মুখে নিভা চোখ বুজে আপনমনেই বলতে লাগলো
—কাকে বলবি—কাকে বলবি—দাঁড়া দাঁড়া ভেবে দেখি।

ভেবে দেখি না ছাই! মনে মনে যার মুখখানা সে ধ্যান করছিল, চট করে তার কথাই সে বলে বসলো।—যা, তবে তোর বিমলদাদাকেই বলে আয়। দোরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে,—যা শীগগীর যা, দেরি করিস নে।

চলো তবে—বলে বিভা তাড়াতাড়ি উঠে তার জুতোজোড়াটা পায়ে দিতে লাগল।

নিভা একটু হেসে বলল, দূর পাগলী! আমি কেন যাব? দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুই নিজে যা।

বেশ। তবে তুমি আমার পুতুলগুলো তুলে রেখে দাও—বলে বিভা ছুটতে ছুটতে অমরেশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অমরেশ নিবিষ্ট মনে তখন একখানি ছবি শেষ করছিল, বিভার এই প্রস্তাবটা তার মন্দ লাগল না।

এই ছুতো নিয়ে বিমলকে আর-একবার যদি সে এ-গাড়ীতে আনতে পারে তো মন্দ কি! তক্ষুণি সে উঠে বলল, চল কিন্তু সে আসবে তো?

খুব আসবে---বলে আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে বিভা তাকে এক রকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল।

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অমরেশ মার্বেল-বারান্দার ওপর এসে দাঁড়াতেই দেখল, নিভা তার ঘরের জানলার কাছে চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবছে।

অমরেশ বলল, বিভার আব্দারটা শুনেছিস নিভা?

আবার দিদিকে কি জিজ্ঞেস করছো, এসো। বিভা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

অমরেশের একখানা হাত ধরে সে টানতে টানতে বলল, এসো।

দাদা, তুমি আর দেরি করো না। দিদিমণি সব জানে—ওই ত আমাকে শিখিয়ে দিলে।

কথাটা শুনে নিভার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বলল, মেয়ের কথা শোনো! আমি বুঝি শিখিয়ে দিলাম? আচ্ছা, কে তোর বেঁধে দেয় তাই আমি দেখবো।

বেশ, বেশ, দিও না- বলে বিভা অমরেশকে আবার টানতে লাগল।

অমরেশ চলে যাচ্ছিল, নিভা বলল, শুনেছো দাদা, তোমার বন্ধু সে দিন বিশ্বনাথকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে একটা চাকরী করে দিয়েছে।

সিঁড়িতে নামতে নামতে অমরেশ বলল, জানি।

তাকে বলো, সে যেন আমাদের একটা রাঁধুনী-বামুন ঠিক করে দিয়ে যায়। আমি রাঁধতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

অমরেশ হাসতে হাসতে বলল, এখন আর সে-কথা বললে কি হবে নিভা, তুই ত নিজেই বিশ্বনাথকে তাড়িয়ে ছিস।

হ্যাঁ তাড়িয়েছি! তাই বলে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরী তো করে দিইনি! চাকরী না পেলে তাকে আবার এখানেই ফিরে আসতে হতো!

ঠাকুরের ভাবনা কি? আর-একজনকে ডেকে আনলেই হবে। চল বিভা, সে বেরিয়ে গেলে আর দেখা পাব না। এই বলে অমরেশ বিভার পিঠে হাত দিয়ে চলবার ইঙ্গিত করল।

নিভা বলল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

কিন্তু অমরেশ সে-কথাটা শুনতে পেল না। সে তখন বিভার হাত ধরে নীচে নেমে গেছে।

গাড়ীতে উঠে বিভা তার দাদাকে বিমল সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকমের অনেক প্রশ্নই করতে লাগল।

অমরেশ দু-একটা কথার উত্তর দিয়ে শেষে বলল একা

তোর বিমলদাদাকে নিমন্ত্রণ করলেই ত চলবে না বিভা, এই সঙ্গে তার বাড়ীর সবাইকে বলিস, বুঝলি?

বিভা বলল, বিমলদাদার বাড়ীতে আর কে-কে আছে দাদা?

তার দিদি আছেন, বাবা আছেন।

বিভা জিজ্ঞেস করল, আর কেউ? ভাই? বোন?

অমরেশ বলল, না।

দেখতে দেখতে অমরেশের গাড়ীখানা বিমলের দরজায় এসে দাঁড়াল।

অমরেশ ভেবেছিল, আজও হয় ত বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে বন্ধ দরজার খিল খোলাতে হবে, কিন্তু সদর দরজাটা খোলা দেখে সে একটুখানি আশ্বস্ত হল।

বিভার হাত ধরে গাড়ী থেকে রাস্তায় এসে নামতেই ঘরের ভিতর থেকে কার যেন একটা তীব্র কর্কশকণ্ঠ অমরেশের কানে এসে বাজল!

কিছুই ঠাহর করতে না পেরে অমরেশ সেই খোলা দরজার বাইরে থেকে ডাকল, বিমল!

ডাক শুনে বাড়ীর ভেতর থেকে গায়ত্রী উঠোনে এসে দাঁড়াল, সামনে দেখলে অমরেশ দাঁড়িয়ে। সঙ্গে একটি মেয়ে। বলল, আসুন।

বিভার হাত ধরে বাড়ীতে ঢুকলো অমরেশ। প্রথমেই পরিচয় করে দিল। বলল, এ আমার ছোট বোন—বিভা। বিমল কি আজও কোথাও বেরিয়ে গেছে নাকি?

গায়ত্রী বলল, কাল থেকে একটি ছেলেকে সে প্রাইভেট পড়াচ্ছে, এক্ষুনি ফিরবে। আসুন।

সামনের বারান্দার ওপর অমরেশের নজর পড়তেই সে দেখল, রত্নেশ্বরের সঙ্গে কে-একটা লোক যেন কথা বলছে।

সম্ভবতঃ তারই গলার আওয়াজ বাইরে থেকে শুনতে পাওয়া

যাচ্ছিল। কিন্তু তার সে তীক্ষ্ণ-কর্কশকণ্ঠ এরই মধ্যে যে কখন এত শান্ত সংযত হয়ে উঠল অমরেশ তা বুঝতে পারল না।

তিনি যে কে এবং কি প্রয়োজনে এখানে এসেছেন, সে-সব কোন কথাই গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করে অমরেশ ধীরে-ধীরে বারান্দার ওপর উঠে গেল এবং রত্নেশ্বরের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি অমরেশের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। অমরেশ ভেবেছিল, চিনতে পারবেন না। কিন্তু না, চিনেছেন ঠিক। বললেন, এসো, এসো বাবা, হ্যাঁ চিনেছি, চিনেছি—তুমিই না সেদিন এসেছিলে? সেই অমরচন্দ্র না—কি তোমার নামটি বাবা?

আজ্ঞে না, অমরচন্দ্র নয়, অমরেশ। তক্তপোষের একপাশে বসে বলল, আপনার শরীর এখন বেশ ভাল আছে ত?

হ্যাঁ বাবা, ভগবান যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি। আচ্ছা বাবা অমরেশ, কই তুমিই বল ত' বাবা, যারা গরীব-দুঃখী মানুষ, তাদের কষ্ট দেওয়া কি ভাল? ত্রিশটা বছর এখানেই কাটালাম, আর ক'টা দিনই-বা বাঁচবো—এই বলে রত্নেশ্বর তাঁর অভ্যাসমত অন্যমনস্ক হয়ে বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন।

কথাটা স্পষ্ট না হলেও তার উত্তরে অমরেশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু যে ভদ্রলোক এতক্ষণ চীৎকার করছিলেন, অমরেশের মুখের কাছে হাত নেড়ে তিনি বলে উঠলেন, আপনি আমাকে কি বলবেন মশাই? ঢের ঢের লোক দেখেছি বাবা, এমন ভাড়াটে ত কখনও দেখিনি!

লোকটা যে এই বাড়ীর মালিক, অমরেশ তা বুঝতে পারল। কথাটা একটুখানি খারাপ শোনাবে জেনেও সে না বলে থাকতে পারল না।

বলল, দেখুন, এই কলকাতা শহরে এমন অনেকগুলো বাড়ীর ভাড়া আমাকেও আদায় করতে হয়,—আপনি কি বলতে চান,

বেশ ভাল করে বলুন তো দেখি,—বাইরে থেকেও আপনার গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

পাবেন না মশাই ? রোজ রোজ আসি আর ফিরে যাই, আমি শালা যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। তিন-তিন মাসের ভাড়া বাকী,—সেই বিমল-ছোকরা বলে, আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি, আর এই বুড়ো, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, পাওনাদার এলেই তো পাগল সেজে বসে থাকেন। এ মাস থেকে আর পঁচিশ টাকায় চলবে না, ত্রিশ টাকা করে ভাড়া দিতে পারেন ভালোই,—না পারেন, উঠে যান। আমি কালই এবাড়ী অন্য লোককে বন্দোবস্ত করব। যাক আমি আর চেঁচাতে পারি না, —তিন পঁচিশং পঁচাত্তোর টাকা, দিন আমার ভাড়া মিটিয়ে দিন। আজ আর আমি এক পয়সা বাকী রাখবো না।

এই বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে রত্নেশ্বরের সুমুখে সে তার একখানা হাত বাড়িয়ে দিল।

তার সেই বাড়ানো হাতখানা ধরে তাকে টেনে সেখান থেকে তুলে দিল অমরেশ খুব হয়েছে, ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আর বেশী গোলমাল করবেন না। আসুন, আপনার ভাড়া আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে বিভা ডাকল, দাদা, এখানে একবার এসো।

যাই—বলে অমরেশ সেই লোকটাকে একরকম টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার গাড়ীর ভেতর বসিয়ে দিয়ে বলল, এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

অমরেশ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে গায়ত্রী বলল, টাকা আপনি ওকে দেবেন না, বিমল টাকা আনতে গেছে।

টাকা সে কোথায় পাবে ?

গায়ত্রী বলল, পঁচিশ টাকা সে আনবে বাকী পঞ্চাশটা টাকা আছে আমার কাছে।

বাড়া-ভাড়াব টাকা আমি মাসে মাসে ঠিক করেই রাখি, কিন্তু উনি ঠিক-সময় টাকা কখখনো নিতে আসেন না। কলকাতাতেও থাকেন না যে, মাসের পর মাস টাকাটা বিমল ওঁর বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসবে, সেইজন্যেই আমাদের বিপদে পড়তে হয়।

তা হোক, টাকাটা আপনি রেখে দিন। বলে অমরেশ আর সেখানে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে চলে যাচ্ছিল, বিভা আবার ডাকল, দাদা!

অমরেশ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুই দিদির কাছে থাক। গিয়েই আমি গাড়ীটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বিমলকে সঙ্গে নিয়ে যাস— কিছুতেই ছাড়িস নে। আর, আপনি জানেন ও আজ এখানে কি জন্যে এসেছে?

গায়ত্রী বলল, জানি।

বিভা বলল, দাদা, চা খেয়ে যাও।

গায়ত্রী তাকে বারণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আর সময় নেই। বিভা তাকে ডেকে ফেলেছে।

কি বিপদে যে পড়লো গায়ত্রী!

ঘরে দুধ নেই;, যেটুকু ছিল, বিকেলে বিমলকে চা করে দিয়েছে, তাই অমরেশকে ডাকতে বলে চায়েব বাটিতে চা ঢেলেও গায়ত্রী অনেকক্ষণ থেকে সেটা নাড়াচাড়া করছিল।

দুধ-না-দেওয়া চা তাকে দেবে কেমন করে? লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এ চা আপনি খেতে পারবেন না। যান আপনি—

অমরেশ নিজের হাতেই চায়ের বাটিটা তুলে নিল। বলল, 'র-চা' আমি ভালবাসি।

চা খেয়ে অমবেশ চলে গেল। ঘণ্টা বাজিয়ে ক্যোচম্যান গাড়ী ছেড়ে দিল।

গায়ত্রী চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল। তারপর সেই প্রায়ান্ধকাব ঘরে উনোনেব আগুনেব শিখায় দেখল, সমস্ত চাটুকু সে নি.শেষে পান করে খালি কাপটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

শীতেব সন্ধ্যা ঘনিযে এসেছিল। বত্নেশ্বর বললেন, সন্ধ্যা দে মা গায়ত্রী!

তুলসীতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিযে গায়ত্রী ঘবে আলো জ্বালল।

সে‍ই আলোকের শিখায় গায়ত্রীব পাশে বত্নেশ্বব বিভাকে দেখতে পেলেন।

তিনি তখন মনে মনে গায়ত্রী এবং সন্ধ্যাব আবাধনা কবে সবেমাত্র চোখ খুলেছেন।

সদ্য-ধ্যানস্তিমিত তাঁব দুই মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এই দুই জ্যোতির্ময়ী নাবী পবম বিস্ময়ে তাঁকে একেবাবে নিবাক কবে দিল।

কোনও কথা তিনি জিজ্ঞেস করতে পারলেন না, কোনও ভাবনা তিনি ভাবতে পাবলেন না। অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাদেব মুখের দিকে তাকিয়ে বইলেন।

এতক্ষণ ধবে তাঁব মনশ্চক্ষেব সামনে যে দুই দেবীমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সেই গায়ত্রী আর সন্ধ্যাই যেন আজ তাঁকে দেখা দিতে এসেছে!—এইটেই তাঁব মনে হতে লাগল।

চোখ দুটি তাঁব জলে ভরে এলো। মা! মা! বলে আকুল আগ্রহে বত্নেশ্বব তাঁব শীর্ণ হাত দুটি সুমুখে বাড়িয়ে দিলেন।

গায়ত্রী বলল, বাবাকে প্রণাম কর বিভা।

সে কি কথা মা! আমি যে তোদের অধম সন্তান। বলতে বলতে দুজনকে দুহাতে ধরে রত্নেশ্বর ঝর ঝর কবে কেঁদে ফেললেন।

গায়ত্রী ডাকল, বাবা!

এতক্ষণে তাঁর যেন তন্দ্রার ঘোর কাটল। বললেন, আমায় ডাকচিস মা? কি বলছিস?

গায়ত্রী বিভাকে দেখিয়ে বলল, এ অমরেশের ছোট বোন —বিভা!

এক হাত দিয়ে বিভার মুখখানি তুলে ধরে রত্নেশ্বর বললেন, আহা, বেশ! বেশ মেয়েটি! বেঁচে থাকো মা। সুখী হও! আনন্দিত হও!

কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, শোন গায়ত্রী, এবার আমি বিমলের বিয়ে দেব।

গায়ত্রী বলল, দাঁড়াও বাবা, বিমল কিছু রোজগার করুক আগে।

রত্নেশ্বর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, ও সব কিছুই নয় মা! তোরা ছেলেমানুষ, বুঝিসনে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কালীমূর্তি দেখেছিস? একদিকে ভয়, আর একদিকে অভয়! দুঃখ দৈন্য যত বড়ই হোক না মা, তার থেকে উদ্ধারের উপায় তিনিই করে রেখেছেন।

ছয়

বিমলের বাড়ী থেকে বিভাকে নিয়ে গাড়ীখানা যখন ফিরে এল রাত্রি তখন প্রায় ন'টা।

বিমল আসেনি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না, তবু নিভা যেন একটুখানি চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনের ভুলে বিভাকে কি-যেন একটা প্রশ্নও কবতে গেল, কিন্তু লজ্জায় আর অভিমানে কণ্ঠে তার ভাষা জোগাল না।

বিমলের না আসার কারণটা বিভার মুখ থেকে শোনবার জন্য সে মনে মনে অত্যন্ত উৎসুক হয়েই নীচে নামবার সিঁড়ির একপাশে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অমরেশ জিজ্ঞেস করল, বিমল এলো না?

বিভা মুখ ভারি করে বলল, কাল সকালে আসবে। বললে, পুতুলের বিয়েতে এত খরচ করবার কি দরকার?

অমরেশ তাকে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। ধীরে ধীরে নিভার ঘরে ঢুকে বলল, নিভা কোথায় রে?

নিভা তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে পালাচ্ছিল।

কৈলাস বলল, নতুন ঠাকুর এসেছে। বোধকরি রান্নাঘরে গেলেন।

তাকে একবার ডাকো ত কৈলাস—বলে অমরেশ একটা চেয়ারের ওপর বসে বিভার চুলগুলো হাতে করে আঁচড়ে দিতে লাগল।

নিভা রান্নাঘরে যায়নি। সিঁড়ি থেকে ফিরে এলো। দাদার কাছে গিয়ে বলল, কি বলছিলে দাদা?

অমরেশ বলল, বিমল আসেনি। পুতুলের বিয়ে বন্ধ করে দে।

নিভা বলল, ঘর-দোর সাজালুম, এ-কথা আগে বললেই হতো।

এটা যে তার নিছক রাগের কথা অমরেশ তা বুঝল। বলল, ঘর-দোর সাজালি, তাতে কি হয়েছে? শুনেছিস, বিমলও ঠিক ওই কথাই বলেছে। বলেছে, পুতুলের বিয়েতে খরচ করতে হয় না।

বলবেই তো! যারা গরীব, খরচের নাম শুনলে তারা আঁতকে ওঠে। বন্ধ করা চলবে না। আমার বন্ধুদের সব নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি।

অমরেশ বলল, না না, এটা বাজে খরচ, তাই বলছিলুম।

নিভা বলে উঠল, ছোট বোনের আব্দারটা বাজে খরচ, আর পরের বাড়ীর ভাড়া মেটানো বুঝি আসল খরচ?

রাগের মাথায় কথাটা বলে ফেলে নিভার চোখমুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। সে আর মুহূর্তমাত্র সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হন হন করে বাইরে এসে ডাকল, বিভা!

বিভা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

অমরেশ বলল, পরের বাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে আমি টাকা খরচ করেছি, আর তুই করিস নে?

সহসা থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে নিভা বলল, এবার থেকে আমাকে খরচের টাকা দাও ত তোমায় অতি বড় দিব্যি থাকলো।

কথাগুলো বলেই নিভা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে বসে পড়ল।

পুতুলের বিয়ের খরচ সম্বন্ধে যে-কথাটা বিমল বলতে বলেছিল, সেটা যেন বিভার না বললেই ভাল হতো। হয়ত এই অপরাধের জন্য দিদি তাকে বকবে, আর বোধহয় সেই জন্যই দিদি তাকে এখানে ডেকে আনলে।

অবশেষে ভয়ে-ভয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কি বলছিলে দিদি?

নিভা তাকে কোলের কাছে টেনে এনে বলল, শুনলি দাদার কথা!

বিভা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দিদির মুখের পানে

তাকিয়ে বসে রইল। না জানি তার এই রাগের সময় কি বলতে কি বলে ফেলবে—তার চেয়ে চুপ করে বসে থাকাই ভালো।

কিছুক্ষণ পরে নিভা বলল, কাল সকালে ওঁদের বারণ করে দিয়ে আসবি। হয়ত বাড়ীর সবাইকে নিয়েই কাল হাজির হবেন বাবু।

বিভা কিছু বুঝতে না পেরেই প্রশ্ন করল, কে দিদি?

কে আবার? এতক্ষণ ছিলি কোথায়? যাদের নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলি।—হ্যাঁরে, কাল সত্যিই তারা আসবে নাকি? তোর বিমলদাদা?

হ্যাঁ।

তার দিদি? তার বাবা?

হ্যাঁ, সব।

তারা কেমন রে?

বিভা এইবার দিদির গলা জড়িয়ে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বলল, না দিদি, আসতে তাদের বারণ করো না। দেখবে কেমন সুন্দর—

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার কাছে কৈলাস এসে দাঁড়াতেই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কি বলছো কৈলাস?

খাবার আনবো কি না তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

নিভা বলল, দাদার খাওয়া হলো?

দাদাবাবু খাবেন না। বললেন, মাথা ধরেছে।

অমরেশের এই মাথা ধরবার হেতুটা যে কি, সে-কথা বুঝতে নিভার বিশেষ বিলম্ব হলো না।

মিছেমিছি এমন রাগ করলে আমি কি করি বল ত। এই বলে নিভা ধীরে-ধীরে সেখান থেকে উঠে গেল।

রাস্তার একটা গ্যাসের আলো উন্মুক্ত জানলার পথে অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল।

স্তিমিত চন্দ্রালোকের মত সেই আলোকচ্ছটায় নিভা দেখল,

টেবিলের ওপর তার দুই প্রসারিত হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে অমরেশ একটা চেয়ারে বসে আছে

তার এই অভিমানক্ষুব্ধ নিস্তব্ধ মূর্তির দিকে নিভা মিনিটকয়েক তাকিয়ে রইল,—কোনো কথা বলতে পারল না। এটা যে তারই কটুভাষণের ফল, তা সে জানে।

মুখে কোনো কথা না বলে নিভা প্রথমে আলোর সুইচটা টিপে দিল। কিন্তু অমরেশ মুখ তুলে একবার চেয়েও দেখল না।

নিভা ডাকল, দাদা।

অমরেশ সাড়া দিল না, যেমন বসে ছিল, তেমনি বসেই রইল।

এইবার একটুখানি কাছে সরে গিয়ে নিভা বলল, দাদা, খাবে এসো।

ধরা-ধরা গলায় অমরেশ তেমনি হেঁটমুখেই উত্তর দিল, মাথা ধরেছে, খাব না।

নিভা আর থাকতে পারল না, অনুশোচনায় তার কান্না পাচ্ছিল। বলল, তোমার পায়ে ধরি দাদা, আর আমি তোমায় কিছু বলবো না।

হ্যাঁ, বলবি নে! যা যা আমি খাব না, যা—বলে অমরেশ পাশ ফিরে মাথাটা তার হাতের মধ্যে বেশ ভাল করে গুঁজে নিল।

নিভা মুখে আর বিশেষ কিছু বলতে পারল না, কিন্তু তার চোখ দিয়ে দরদর করে খানিকটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। টেবিলের ওপর হাত রেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ নিভার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে অমরেশ মুখ তুলে চাইতেই নিভার আনত সজল চোখ দুটির দিকে তার দৃষ্টি পড়ে গেল।

বলল, নিজে ঝগড়া করে আবার কান্না হচ্ছে কেন, শুনি?

কাঁদতে আমার বয়ে গেছে। খাবে তো খাবে, না খাবে না খাবে। এই বলে নিভা সেখান হতে চলে যাচ্ছিল।

এবার তার দুর্জয় অভিমানের পালা শুরু হবে ভেবে অমরেশ খপ করে তার হাতখানা ধরে ফেলে বলল, বল তোর দিব্যি তুই ফিরিয়ে নিলি, তাহলে আমি খেতে যাচ্ছি। বল, তুই রাগিস নি।

না রাগি নি, এসো- -বলে নিভা একটু হেসে তাকে চেয়ার থেকে তুলে দিল।

অমরেশ বলল, তবে তুই দিব্যি দিলি কেন ?

তুমি আমার খরচের কথা তুললে কেন ?

তুই কেন বললি নে,—বেশ করবো, তাতে তোমার কি ?

কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে দেখে নিভা বলল, এবার থেকে তাই বলবো, এসো, বিভা এখনও খায়নি।

সে রাত্রির মত এই দুই ভাই-বোনের ঝগড়া একরকম মিটে গেল। অমরেশ আর বিভাকে খেতে দিয়ে নিভা তাদের সামনে বসে রইল। বলল, নতুন বামুন-ঠাকুর কেমন রেঁধেছে দাদা ? রাঁধতে পারবে ত ?

অমরেশ বলল, মন্দ রাঁধে নি। কাল সকালেই বোধ হয় বিমলরা সবাই আসবে। তোর বন্ধু কে কে আসছে ?

তিন চার জনের বেশী নয়। খরচ বেশী হবে না তোমার।

অমরেশ মুখ তুলে বলল, আবার সেই কথা ?

নিভা চুপ করে রইল।

বিভা বলল, কাল অনেক ফুল এনে দিতে হবে দাদা, দেবে ত ?

অমরেশ বিভার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তোমার মেয়ের বিয়ে, ফুল তো দিতেই হবে, নিশ্চয়ই দেব।

পরদিন সকালেও বিমলের দেখা নেই। দুপুরে আহারাদির পর অমরেশ বলল, বোধ করি তারা খেয়ে-দেয়ে আসছে। আমি ফুল নিয়ে আসি, ওরা এলে বসিয়ে রাখিস নিভা।

নিভা ঈষৎ হেসে বলল, হ্যাঁ, বসিয়েই রাখবো দাদা, দাঁড় করিয়ে রাখব না। তুমি যাও।

অমরেশ চলে গেল আর ঠিক তার পরেই বিমল এসে ডাকল, অমরেশ!

বিভা ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বের হয়ে এল। বলল, সকালে এলে না যে বিমলদা? দিদি কোথায়?

আবার দিদি কেন রে? আমি নিজেই এলুম।

না, তা হবে না। এখুনি নিয়ে এসো, চল—বলে বিভা তার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল.

বিমলের গলার আওয়াজ শুনে নিভা ঘরের ভেতর নিজেকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল: বাইরে খানিক পরে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, দাদা আপনাকে বসতে বলে গেছেন, আসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

জুতো খুলে বিমল ঘরের ভেতর ঢুকলো। নিভা তার নতুন জুতো জোড়াটার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, পায়ে দিয়েই এলেন না কেন? নইলে আবার সেদিনের মত কেউ যদি ফেলে দেয়?

কথাটা শুনে বিমল একটু হাসল শুধু।

বিভা বলল, এসো বিমলদা, এই ঘরটা দিদি কেমন সাজিয়েছে দেখবে এসো।

পাশের ঘরটা টেবিল, চেয়ার, ছবি এবং বড় বড় আয়না দিয়ে বেশ ভাল করে সাজান হয়েছিল। বিমল জিজ্ঞেস করল, এ ঘরে কি হবে?

বিভা বলল, ওই দেখছো না, কোণে টেবিল হারমোনিয়াম রয়েছে, দিদি ওখানে বসে গান করবে, আর তোমরা এই চেয়ারে বসে শুনবে।

বিমল বলল, তারপর?

তারপর, এই টেবিলে তোমাদের খাবার ধরে দেবে, তোমরা খাবে।

আমরা ত সায়েব নই, আমরা যে মাটিতে বসে খাই।

পেছন থেকে নিভা উত্তর দিল, সায়েবদের বাড়ী নেমন্তন্ন যখন নিয়েছেন তখন টেবিলে বসেই খেতে হবে।

বিভা বলল, ধেৎ। আমরা বুঝি সায়েব?

উনি ত সেই কথাই বলতে চান—বলে নিভা গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, না—না, আমি সে কথা বলতে চাইনে।

নিভা বলল, তবে?

বিমল বলল, না কিছু না।—এ বেশ হয়েছে। একটুখানি থেমে আবার বলল, কিন্তু এত বেশী বাড়াবাড়ি—

কথাটা নিভা যে জানত না তা নয়।

এ-বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিষে, এমন-কি তার নিজের সাজ-পোষাকেও আড়ম্বর একটুখানি বেশিই আছে,—ইচ্ছা করলেই ত আজ এই মুহূর্তেই তাদের পরিত্যাগ করা যায় না!

গতরাত্রে তার দাদাও বুঝি এই কথাটাই আভাসে-ইঙ্গিতে তাকে বলতে চেয়েছিল এবং এই নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে সমস্ত রাত্রি সে ঘুমোতে পারে নি, মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে একরকম বিনিদ্রই কাটিয়েছে সারাটা রাত।

আজও যেন তাকে ইঙ্গিত করেই বিমল এই কথাটা বলেছে, এইটেই তার মনে হতে লাগল।

বিভা বলল, এ রকম করে সাজানো তোমার মনে ধরছে না বিমলদা?

বিমল ঘাড় নেড়ে বলল, না।

কথাটা বলেই তার মনে হলো নিভা নিশ্চয়ই কথাটার প্রতিবাদ করবে, কিন্তু প্রতিবাদ করা দূরে থাক, সে বরং তার আরও কাছে সরে এসে বলল, আচ্ছা, এই পাশের ঘরটা ত খালি পড়েই রয়েছে, ঘরখানাও বেশ বড়, এইটা আপনি সাজিয়ে দিন না?

সেদিন বিশ্বনাথ-ঠাকুরের কাছে এই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বিমল শুনেছিল।

শুনেছিল, মেয়েটি ভাল, কিন্তু বড় খামখেয়ালী, বড় চঞ্চল। কিন্তু আজ সে তার আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় চঞ্চলতার লেশমাত্র খুঁজে পেলো না। মনে হলো—স্থির ধীর, মেয়েটি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির।

বিমল বলল, ঘর সাজাতে আমি কি পারব?

কেন পারবেন না? চলুন।

বিভা বলল চল বিমলদা।

এ-অনুরোধ বিমল উপেক্ষা করতে পারল না। তাকে সেখান থেকে উঠতে হলো।

ঘরে আসবাব-পত্র কিছু নেই। চার-পাঁচটা বড় বড় জানলার পথে প্রচুর আলো-বাতাস ঢুকছে।

ঘরে ঢুকেই নিভার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমল বলল, কিছুতেই ছাড়বে না?

দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে নিভা বলল, না ছাড়বো না।

তবে দেখি। এসো।

এই বলে তারা কাজে লেগে গেল।

সবার আগে অমরেশের ঘর থেকে তার নিজের আঁকা কয়েকটি ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি আনা হলো।

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বিমল ছবি টাঙ্গাচ্ছে আর, নিভা তার হাতের কাছে পেরেক তুলে দিচ্ছে।

নিভা বলল, বন্ধুর আঁকা ছবিগুলো না-হয় টাঙ্গালেন, তারপর কি হবে?

পেরেকের ওপর হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বিমল বলল, শেষ পর্যন্ত দেখই-না কি-হয়। আর একটা পেরেক দাও।

পেরেকটা হাতে দিতে গিয়ে বিমলের হাতে তার হাত ঠেকে গেল।

সামান্য একটুখানি স্পর্শ। কিন্তু কে জানতো তাইতেই তার সমস্ত শরীর এমন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে!

বিমল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।—তবে কি নিভারও ওই যৌবনশ্রীমণ্ডিত তনুদেহে ঠিক এমনি শিহরণ জেগেছে?

হবেও-বা।

নইলে তারই-বা এমন ভাবান্তর হলো কেন? এতক্ষণ সে বিমলকে 'আপনি' বলছিল, হঠাৎ মনের ভুলে কিনা কেজানে, বলে বসলো, বলবে না?

—কী বলব না?

নিভা তার ঢলঢলে চোখের পাতাটি তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললে, এর পর কি হবে?

কথাটার জবাব না দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বিমল এত জোরে জোরে হাতুড়িটা পেরেকের উপর ঠুকে ফেলল যে, পেরেকটা দেয়ালের গায়ে একেবারেই বসে গেল।—এই যাঃ! এটা গেল, আর একটা দাও।

নিভা আর-একটা পেরেক নিয়ে হাত বাড়াল, বিমল কিন্তু তা ধরতে পারল না। তার হাতটা বোধহয় কাঁপছে। পেরেকটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

নিভা পুনবায় সেটি কুড়িয়ে নিয়ে বিমলের হাতের ভিতর জোর করে গুঁজে দিল।

বিমল টুল থেকে নেমে পড়ল, একটা চাকর ডাকলে হতো না? আমরা দেখিয়ে দিতুম।

একজন চাকরকে নিভা অনায়াসেই ডাকতে পারত, কিন্তু ডাকল না; বলল, হয়ে গেল? আচ্ছা, আমি টাঙিয়ে দিচ্ছি, আপনি পেরেক তুলে দিন।

আবার 'আপনি' বলছে নিভা।

বিমলকে রাজি হতে হলো।

এ-হাত সে-হাত করে কোন রকমে এই পনর মিনিটের তুঃসাধ্য কর্মটি তুজনে মিলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শেষ করল।

শতরঞ্চি, গালিচা, চাদর, বালিস দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর ঢালা বিছানা হচ্ছিল, এমন সময় অমরেশ ফিরে এল। বলল, এ আবার কি হচ্ছে রে? এ-ঘরে কি হবে?

নিভা বলল, আমাব সাজানো ঘরটা কারও পছন্দ হলো না।

অমরেশ বলল, হাঁরে বিমল, দিদি কোথায়? বাবা এলেন না?

ওরা কি জন্যে আসবে?

বিভা কাছেই বসে ছিল, বলল, না বিমলদা, তা হবে না,—আমার মেয়ের বিয়ে, তার মাসী আসবে ন? বিয়ে কেমন করে হবে বল ত? তাহলে তোমাব যখন বিয়ে হবে, আমরা কেউ যাবো না।

অমরেশ বলল, কি কি করতে হবে বল, আমি করিয়ে দিচ্ছি। বিমল, তুই বাড়ী গিয়ে ওদের নিয়ে আয়।

বিমল বলল যাচ্ছি।

'যাচ্ছি' বলেও বিমল ইতস্তত করছিল।

নিভার সম্মতি চেয়েই বোধকরি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল একবার। নিভা চোখ দিয়ে তার নীরব সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলল না।

অমরেশ বলল, আমার গাড়ীটা নিয়ে যা।

বিমলকে যেতে হলো।

যেতে হলো নিতান্ত অনিচ্ছায়।

দেখতে দেখতে নিভার নিমন্ত্রিত মহিলা বন্ধু কয়েকজন এসে জুটল।

চাকরদের নিয়ে বিমলের কাজটা অমরেশই করে ফেললে। ঘরখানা সাজিয়ে চারটা ধূপদামিতে প্রচুর পরিমাণে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে বিমলের আগমন প্রতীক্ষায় বসে রইল।

বেলা পড়ে এল, তবু বিমলের ফেরবার নাম নেই।

অমরেশ কৈলাসকে ডেকে বলল, আমি এই কাগজে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, তুমি একবার বিমলবাবুর বাড়ীতে যাও দেখি। গাড়ী নিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না কেন বুঝতে পারছি না।

কৈলাস বলল, গাড়ী ত কেউ নিয়ে যায় নি বাবু, সহিস-কোচুয়ান ত আস্তাবলে রয়েছে।

অমরেশ বললে, নিশ্চয়ই নিয়ে গেছে। আমি যে বললুম নিয়ে যেতে।

কৈলাস বলল, আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি এইমাত্র আস্তাবলে গিয়েছিলুম।

তা হলে হয় ত সে গাড়ী না নিয়েই চলে গেছে, তুমি একবার যাও, দেখে এসো তার কেন এত দেরী হচ্ছে।

যে আজ্ঞে—বলে কৈলাস বের হয়ে গেল।

ভাল পোষাক বেব করে দেবার জন্য বিভা অনেকক্ষণ থেকে দিদির পৈছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বন্ধুদের জলখাবার ধরে দিয়ে নিভা তাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বলল, ছি বিভা, আজ তোর মেয়ের বিয়ে, আজ আর তোকে দামী পোষাক পরতে হয় না। বোনঝির.বিয়েতে আজ আমি কি পরেছি দেখেছিস?—এই বলে নিভা তার নিজের শাড়ী ব্লাউজ দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে দিল।

বন্ধুরা বলল, অনেক দিন তোমার গান শুনিনি নিভা, তুমি গান গাও।

নিভা আজ গান গাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিন্তু তবু কি জানি কেন সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

কিন্তু বন্ধুরা শুনল না। জোর করে তাকে হারমোনিয়ামের সামনে বসিয়ে দিল।

একজন বলল, গা না ভাই, দেরী করছিস কার জন্যে?

কিন্তু কার জন্য দেরী—মুখ ফুটে সেকথা বলাও যায় না ছাই।

সাত

অমরেশ নিজেই গেছে বিমলের খোঁজ করতে

কিন্তু তাও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে !

এদিকে বন্ধুদের ক্রমাগত অনুরোধ—নিভা, গান গাও। নিভা গান গাও।

হ্যাঁ, আজ সে গান গাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে তার মনের ভাষা গানে প্রকাশ করতো আর তার শ্রোতা ছিল মাত্র একজন।

সেই শ্রোতাই যখন অনুপস্থিত তখন সে গাইবে কার জন্য ?

বিমলের ওপর মনে-মনে তার রাগ হতে লাগলো। এ কি রকম পুরুষ মানুষ কে জানে! কোনোদিন সে তার কথার ঠিক রাখে না। বলে এক, করে আর। নিতান্ত খেয়ালী, নিতান্ত উদাসীন।

আজ এই এতগুলি বন্ধু এসেছে তার, ভেবেছিল—তাদের সুমুখে বিমলের সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করবে যা দেখে বন্ধুরা হয়ত-বা কেউ কেউ একটু সন্দেহ করবে, একটু ঈর্ষা করবে।

কিন্তু কিছুই সে করাতে পারল না তাদের।

বিমলের ওপর রাগ হলো তার।

গান তাকে গাইতে হলো।

কিন্তু প্রাণহীন সে গান।

একটি মেয়ে বলে উঠল, গলা তোর খারাপ হয়ে গেছে নিভা।

গলা তার সত্যিই খারাপ হয়েছে কি-না অন্যদিন হলে নিভা তা বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু নিন্দা, প্রশংসা আজ তার গায়ে বাজল না। বরঞ্চ, তাতেই সায় দিয়ে বলল, হাঁ ভাই, তাই যেন মনে হচ্ছে।—দাঁড়া ভাই, তোরা একটু বোস্, ঠাকুর রান্নার কি কতদূর

করলে আমি একবার দেখে আসি।—বলে সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

নিভা চলে যেতেই মেয়েদের আলোচনা শুরু হলো।

—কি হয়েছে বল তো নিভার?

কেউ কিছু জানে না। বলবেই-বা কেমন করে?

—হবে আবার কি? কিছুই তো হয়নি।

—বড়লোকের মেয়ে, একটু গদগদ-ভাব, এই আর-কি!

একজন বললে, উহুঁ, রাগ-অভিমান হয়েছে কারও সঙ্গে। দেখলি না, গয়না-কাপড় কিছু পরেনি!

—না রে ভাই, গয়না-কাপড়ের অভাব যাদের নেই, তারা পরে না। এইটেই আজকালকার ফ্যাসান।

একজন মেয়ে কিন্তু সবাইকে চুপ করিয়ে দিলে মাত্র একটা কথা বলে। বলল, তোরা কেউ কিছু জানিস না। আমার মনে হয় নিভা নিশ্চয় কারও প্রেমে পড়েছে।

একজন কলেজের ছাত্রী বসেছিল ঘরের এক কোণে, সে বলল, প্রেমে পড়ার মহিমা তুই জানিস তাহ'লে?

জানি। তিনবার তিনজনের প্রেমে পড়লাম। একটাও টি'কলো না।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

ওদিকে নিভা তখন তার নিজের ঘরের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অমরেশের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু মিনিট-দশেক বৃথাই তাকিয়ে থেকে কাউকেও যখন দেখতে পেল না, তখন সে বিষণ্ণ মুখে ধীরে-ধীরে নীচে নেমে গেল।

পাকা-মেয়ের মত বিভা রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর বসে নতুন ঠাকুরকে কত-কি উপদেশ দিচ্ছিল। দিদিকে নেমে আসতে দেখে চুপ করল।

নিভা একটু হেসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, কি গো কনের মা, হলো তোমার?

বিভা বলল তুমি আবার কি জন্যে নেমে এলে দিদি? হলে ডাকব, যাও।

কৈলাসের সন্ধানে নিভা একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। কিন্তু লজ্জায় তাকে ডাকতে পারল না। শেষে নিজেই সে বাইরের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেল, কিন্তু সেখানেও তাকে দেখতে না পেয়ে তার অত্যন্ত রাগ হলো। ফিরে এসে বলল, কৈলাস কি দাদার সঙ্গে গেছে না কি রে বিভা?

বিভা বলল, না, সে বাজারে গেছে মিষ্টি আনতে।

সে যে কত ক্ষণ গেছে নিভা তা জানত না। বলে উঠল, গেছে সে কি আজ না কাল? ফিরবে কখন তার ঠিক নেই।

না দিদিমণি, বেশি দেরি ত আমার হয় নি।

নিভা পিছন ফিরে দেখল, মিষ্টির চুপড়ি হাতে নিয়ে কৈলাস তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, ওটা নামিয়ে রেখে—এস একবার শোনো ত কৈলাস।

কৈলাসকে সঙ্গে নিয়ে নিভা ওপরে উঠে গেল এবং তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ওদের বাড়ীতে তুমি কি দেখলে কৈলাস?

কৈলাস প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেনি। বলল, কাদের বাড়ীতে দিদিমণি? কখন?

গাঁজা-টাজা খেয়েছ নাকি? বলছি—বিমলবাবুদের বাড়ী। তুমিই গিয়েছিলে না?

কৈলাস একটু অপ্রতিভ হয়ে ধীরে-ধীরে বলল, আমি ত বাড়ীর ভেতর যাই নি দিদিমণি। বিমলবাবুকে ডাকতেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, আমি ত যেতে পারব না কৈলাস, বাবার যে হঠাৎ কি হলো কিছু বুঝতে পারছি না। তার চেয়ে তুমি বরং

তোমাদের দাদাবাবুকে একবার—। এই পর্যন্ত বলেই উনি তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলেন। কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

নিভা তার মুক্তোর মত দাঁত দিয়ে হিঙ্গুল-বরণ পাৎলা ঠোঁটটি একবার চেপে ধরল। বলল, দাদা ত কই এখনও ফিরল না। এদের আমি তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিদেয় কবি। দাদা যদি তখনও না ফেরে ত—আচ্ছা যাও। দেখ ত ঠাকুরের সব হলো কি না। রাঁধতে এত দেরী করলে কিন্তু চলবে না বাপু, ওকে বলে দাও।

কৈলাস বোধ করি তাই বলবার জন্যে চলে গেল।

নিভা আর-একবাব তাব ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে, তারপর বন্ধুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

খাইয়ে-দাইয়ে তাদের বিদায় করতেই রাত্রি প্রায় ন'টা বেজে গেল।

দাদা তখনও ফিরছে না দেখে নিভা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। বিভা তুই খেয়ে নে ভাই, আমি একবার কৈলাসকে সঙ্গে নিয়ে দেখে আসি। কেমন?

বিভা বলে উঠল, হ্যাঁ, তা বই-কি। আমি বুঝি যাব না? আমি একলা বাড়ীতে থাকি কেমন করে বল ত?

নিভা চায় না তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। গম্ভীর হয়ে বলল, বেশী পাকামি করিস নে বিভা; ঠাকুর রইলো, দুটো চাকর রইলো, একটা ঝি রইলো, বেশ থাকতে পারবি।

বলল বটে, কিন্তু এই বোনটিকে একা ঘরে ফেলে রেখে যাবেই-বা কেমন করে, আধার নিয়ে যাওয়াও মুস্কিল। না-জানি সেখানে কি বিপদ ঘটেছে—এই ছোট মেয়েটা সেখানে গিয়েই-বা কি করবে!

উপায়হীনের উত্তেজনার মুহূর্তে যেমন রাগ করবার পাত্রাপাত্র বিচার থাকে না, নিভাও তেমনি বিভার ওপর রাগ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। নিভা যখন রাগ করে, বিভার মুখখানি তখন ভয়ে-ভাবনায় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

নিভার সে রাগ থামতে-না-থামতে সিঁড়ির ওপর কার জুতোর শব্দ হলো। উৎকণ্ঠিতা নিভা সে-দিকে ফিরে তাকাতেই দেখল,—তার দাদা।

নিভার ভয় হলো না জানি কি মন্দ খবর নিয়ে এসেছে তার দাদা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে অমরেশের মুখের পানে চেয়ে।

অমরেশ নিজেই বলল, বিপদের ওপর বিপদ দেখেছিস নিভা? একে বেচারীর চাকরি নেই, তার ওপর হঠাৎ আজ তার বাবার বাঁ-হাতটা 'প্যারালাইজ্‌ড্‌' হয়ে গেল।

প্যারালিসিস্‌?

হ্যাঁ। কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছিল। বুড়ো মানুষ, কি যে হবে—সে না হয় পাকা ফল হয়েই রয়েছে, কিন্তু বিমলের অবস্থাটা একবার ভেবে ছ্যাখ।

বাড়ীতেও ত কেউ নেই, এক দিদি ছাড়া?

না—বলে অমরেশ কাপড় জামা ছাড়বার জন্য তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমাদের খাবার নিয়ে এসো ঠাকুর। নিভা বলল।

খেতে বসে অমরেশ বলল, কাল আমাদের ওই রামধনি চাকরটাকে বিমলের বাড়ী পাঠিয়ে দিই, দিন-কতক কাজকর্ম করে দিক, তা নইলে ওদের বড় কষ্ট হবে। তুই কি বলিস নিভা?

নিভা বলল, ছ্যাখো ত। চাকর পাঠাবে, তার আমি কি বলব? আমাকে কি জিজ্ঞেস করছো?

অমরেশ মুখ তুলে নিভার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এতেই রাগ হয়ে গেল তোর?

নিভা বলে উঠল, হবে না? তোমার বন্ধুর বাড়ীতে বিপদ, চাকর পাঠাবে না ডাক্তার পাঠাবে, আমি কি তোমাকে বারণ করব নাকি?

অমরেশ ধীরে-ধীরে বলল, না রে না, তা নয়। সেদিন

বিমলের বাড়ীর ভাড়াটা মিটিয়ে দিলুম, পরের বাড়ীর ভাড়া মেটানো নিয়ে তুই খোঁটা দিয়ে কথা বললি, তাই তোকে একবার কথাটা জিজ্ঞেস করলুম। বিমলকে তুই দু'চক্ষে দেখতে পারিস নে তা আমি জানি, কিন্তু ওরা বড় গরীব রে! দু'বেলা ভাল করে খেতে পায় কি না কে-জানে।

পাতের লুচিগুলো নিভা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সেগুলো খেতে তার আর ভাল লাগছিল না।

অমরেশ আবার বলল, বিশ্বাস না হয়, কাল তুই আমার সঙ্গে চ একবার, স্বচক্ষে তাদের অবস্থাটা একবার দেখেই আসবি। আর এই বিপদের সময় আমাদের সকলেরই একবার যাওয়া উচিত।

বেশ, যাব। বলে নিভা চুপ করে রইল।

পরদিন সকালে ঘরের গাড়ী ডেকে রামধনিকে সঙ্গে নিয়ে অমরেশ বলল, আয় নিভা, শীগগির তৈরী হয়ে নে।

নিভা যেমন বসেছিল, তেমনি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

অমরেশ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, সে কি রে? অমনি চলো? কাপড়-জামা বদলাবি না?

তাতে কি হয়েছে দাদা, চলো না!—বলে নিভা তার কাছে এসে দাঁড়াতেই, অমরেশ বলল, না, না, সে হতে পারে না নিভা, সে হতেই পারে না। এ তুই আমার ওপর রাগ করে পরেছিস। না না, লক্ষ্মী দিদি আমার, ভাল কাপড় পরে আয়।—এই বলে অমরেশ তার হাত ধরে মিনতি অনুরোধ করল।

নিভা হেসে বলল, রাগ কেন করব দাদা, এতে রাগের তুমি কি দেখলে—

আমি কি আর সেদিন সত্যি সত্যিই বলেছিলুম রে? রাগের মাথায় তোর সাজ-পোষাকের কথা বলে ফেলেছিলুম। যা ভাই যা, আর কষ্ট দিস নে।

অমরেশ এমন সকরুণ ভাবে তার মুখের পানে তাকাল যে, নিভা আর তা সহ্য করতে পারল না। দাদা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাকে উপহাস করে, দুটো মন্দ কথা বলে—সবই সহ্য হয়, কিন্তু তার মুখের দিকে অমন করে এই যে একান্ত দুটি স্নেহ-প্রবণ চোখের মিনতিকাতর দৃষ্টি, একে ত উপেক্ষা করা যায় না। বাধ্য হয়ে নিভাকে আবার তার ঘরে ফিরতে হল এবং আলমারি খুলে তার একখানি দামী শাড়ী আর জামা গায়ে দিয়ে সে যখন বের হয়ে এল, সত্যি কথা বলতে গেলে, তখন তাকে আগেকার চেয়ে কোনও অংশেই মন্দ দেখাচ্ছিল না।

আজ আর বিমলের বন্ধ-দরজা বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে খোলাতে হলো না। দোর খোলাই ছিল।

অমরেশ আগে চলল, তার পেছনে নিভা এবং সবার পেছনে রামধনি উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। নিভার মতন অমন সুন্দরী মেয়ে এ-বাড়ীতে কেউ কখনও এসেছে বলে মনে হয় না। তাই বোধহয় ভুলি কুকুরের বাচ্ছাদুটো খেউ-খেউ করে সবার আগে তাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে ছুটে এল। নিভা ভয়ে একটুখানি বিব্রত হয়ে পিছু হাঁটতেই তারা মায়ের কোলের কাছে গিয়ে মুখ লুকোল।

নিভা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ীটা ভাল করে দেখে নিল। কলকাতা শহরে সব বাড়ীই যে তাদের বাড়ীর মত নয় তা সে জানে। বিমল যে গরীব—সেকথাও তার অজানা নয়। কিন্তু বাড়ীটা যে এত নোংরা তা সে ভাবতে পারেনি। বড়লোকের মেয়ে নিভা, বাল্যকাল থেকে এমন আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে—যেখানে দারিদ্র্যের আস্বাদ ছিল তার কাছে অজ্ঞাত। দরিদ্র ছিল দয়ার পাত্র। আজ সে এখানে এসে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল সেই দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ। দেখল, প্রাচীর ভাঙা, স্যাঁতসেঁতে উঠোন, ঘরের ভেতর পায়রার বাসা—এমনি সব দরিদ্র্যের কত চিহ্ন।

একটি বিধবা তরুণী তার অনবদ্য রূপ নিয়ে বৃদ্ধ রুগ্ন বাপের

হাতের ওপর ফ্লানেল দিয়ে বোতলের সেঁক দিচ্ছে। এই বুঝি বিমলের সেই দিদি। নিভা যার নাম জানে, অথচ চেনে না। গায়ত্রীর সম্বন্ধে মন-গড়া একটা ধারণা সে করে রেখেছিল। ভেবেছিল, সাধারণ বিধবারা যেমন হয়ে থাকে, সে-ও বুঝি তেমনি একটি মেয়ে। কিন্তু গায়ত্রীব এই অপরূপ রূপের ঐশ্বর্য দেখে তার সে মন-গড়া ধারণাটা পালটে গেল। গায়ত্রী এতক্ষণ কোনোদিকে না তাকিয়ে বাপের সেবা করছিল, অন্যদিকে তাকাবার অবসর ছিল না। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই, অমরেশ জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন উনি?

'ভালোই। এসো।—বলে গায়ত্রী তার হাতের বোতলটা মেঝেতে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অমরেশ নিভার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এ আমার বোন নিভা।

বলতে হবে না, চিনেছি। এসো ভাই।—বলে তার হাত ধরে বিমলের ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে হাতল-ভাঙা চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বোসো।

নিভা বসতে ইতস্ততঃ করছিল, গায়ত্রী বলল, গরীবের বাড়ী—অসুবিধে একটু হবেই। তবে—

এমন সময় বারান্দা থেকে কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ রত্নেশ্বরের ডাক শোনা গেল, গায়ত্রী!

যাই বাবা।—বলে পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গায়ত্রী নিভার একখানি হাত চেপে ধরে তাঁর মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বলল, 'আজ যে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড আলাপ-পরিচয় করবো, তার সময় নেই ভাই। বিমল! জল গরম হলো? ভাতের হাঁড়িটা হয়েছে তো নামিয়ে দিস। পারবি? না যাব?—বলতে বলতে গায়ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিভা সবই শুনল, কিন্তু বলি-বলি করেও একটা কথাও তার

বলা হলো না। বাইরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে কাঠের একটা পুতুলের মত সেই ভাঙা চেয়ারের ওপর নির্বাক হয়ে সে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে তারই চোখের সুমুখে ধূমায়মান একটা গরম জলের ডেকচি পরণের কাপড় দিয়ে অতি সাবধানে চেপে ধরে বিমল বারান্দার ওপর ঠাই করে নামাল। হয়ত ভাতের হাঁড়িটাও সে নিজেই নামিয়ে এসেছে। নিভার ইচ্ছা করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার হাত থেকে ডেকচিটা কেড়ে নেয়, কিন্তু উঠে গিয়ে ইচ্ছাটা কার্যে পরিণত করা দূরে থাক সে একবার উঠে দাঁড়াতেও পারল না। এমন কি, পাছে তার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়, এই লজ্জায়, নিভা অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে নিলে।

অমরেশের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিমলের বোধকরি নজর পড়ল নিভার দিকে। বলল, নিভাও এসেছে বুঝি?

অমরেশ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

এইবার নিভা মুখ তুলে বিমলের দিকে তাকাল।

বিমল আর কোন কথা বলল না। হেঁট মুখে ডেকচির জলটা বোতলে পুরতে লাগল।

নিভার মনে হল, সে যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের প্রাণী! এখানকার এই লোকগুলির সঙ্গে আজ যেন তার কোথাও কোনো সূত্রেই এক হয়ে মিলবার উপায় নেই! এই বিমলের, এই গায়ত্রীর সেবা দেখে, তারও মধ্যে এক সেবাব্রতা নারী ধীরে-ধীরে জেগে উঠছিল, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, ... মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে সেও তাদের সঙ্গে অমনি করে সেবা-শুশ্রূষা করে, কিন্তু কেমন করে যাবে, গেলেও সে পারবে কি-না কে জানে। জীবনে কোনোদিন কারও সেবা সে করেনি, করবার সুযোগ সে পায়নি। অপরের সেবা সে চিরদিন গ্রহণই করেছে শুধু। আজ যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল—নারীজীবনের দুর্ভাগ্য।

ছি ছি, কেন সে আজ এখানে এলো? দাদাই বা তাকে নিয়ে এলো কেন? এদের এই বিপদের মাঝখানে কাঠের পুতুলের মত চুপ করে বসে থাকতে তার ভাল লাগছিল না।

বেশ তো ছিল সে, সাদামাটা একটা কাপড় পরেই এখানে আসছিল, দাদা তাকে কাপড় জামা বদলে আসতে বলল। তা যদি সে না বদলাতো, তাহলে এত বেমানান মনে হতো না তাকে।

নিভার মনে হতে লাগলো—তার এই সিল্কের শাড়ী ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়ে বিমলের দিদির মত সাদা একখানা শাড়ী পরে কোমর বেঁধে কাজ করে ওদের সঙ্গে।

তার এই শাড়ী-ব্লাউস, তার এই জড়োয়ার গয়না আর এই চোখ-ঝলসানো প্রসাধন দেখেই বোধকরি বিমল তার দিকে একটিবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

নিভা উঠে দাঁড়াল। একবার মনে হলো দাদাকে ডেকে বলে, তার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, সে বাড়ী যাবে।

কিন্তু বলতে হলো না। অমরেশ নিজেই বলল, এই রামধনি চাকরটাকে রেখে যাচ্ছি বিমল, কাজটাজ ওকে দিয়েই করাস্।

বিমল শুধু বললে, কোনও দরকার ছিল না। অমরেশ কিন্তু কোনো কথাই শুনলো না তার। বলল, তুই চুপ কর। আমি যা বলছি শোন। রামধনি সকালে আসবে, কাজকর্ম করবে, দুপুরে একবার চট করে গিয়ে খেয়ে আসবে, তারপর সারাদিন কাজ করে রাত্রে চলে যাবে আমার ওখানে।

বিমল ম্লান একটু হেসে বলল, অর্থাৎ এখানে খাবে না শোবে না, শুধু কাজ করবে।

অমরেশ বলল, হ্যাঁ তাই।

বিমল বলল, সেরকম লোক আমি রাখব না। যাকে খেতে দিতে পারব না, শোবার জায়গা দিতে পারব না তার কাজও আমি নিতে পারব না।

—তোকে নিয়ে বেশ বিপদে পড়লাম দেখছি। এটুকু উপকারও কি তুই আমার নিবি না?

বিমল বলল, না।

—বেশ তবে তোর যা খুশি তাই করবি। আমি রামধনিকে রেখে গেলাম এইখানে।

এই বলে অমরেশ ডাকল, নিভা, আয়।

নিভা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গাড়ীতে উঠে নিভা জিজ্ঞেস করল, রামধনিকে রেখে এলে বুঝি?

অমরেশ শুধু বলল, হ্যাঁ।

এই রামধনিকে নিয়ে বিমলের সঙ্গে তার যে-সব কথা হয়েছে, কিছুই সে বলল না নিভাকে।

নিভাও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

বিমল সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে তার লজ্জা করছিল, তবু হঠাৎ একসময় বলে বসল, আচ্ছা দাদা, বিমলবাবু তোমার কাছে কোনোদিন টাকাকড়ি কিছু চায়নি?

অমরেশ বলল, তুই বুঝি ভাবছিস, বিমলকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি টাকাকড়ি দিচ্ছি, না?

নিভা বলল, না তা আমি বলছি না, আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি—কোনোদিন সে কিছু চেয়েছে কি না।

অমরেশ বলল, বিমলকে তুই সহ্য করতে পারিস না তা আমি জানি। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি তোকে—তুই দেখে নিস, টাকার অভাবে ওদের যদি উপোস করতে হয় তবুও কোনোদিন মুখ ফুটে কারও কাছে একটি পয়সাও চাইবে না।

নিভা কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, তুমি নিজে ওকে কিছু দেবার চেষ্টা করো। দেখো নেয় কি না।

নেবে না। আমি জানি।

অমরেশ বলল, তোকে বলতে আমি ভুলে গেছি। সেই যে ওর বাড়ীওলাকে যে-টাকা আমি দিয়েছিলাম, সেদিন জোর করে বিমল আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে-টাকা।

নিভা আর কোনও কথা বলল না। গাড়ীর জানলার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কলকাতার রাস্তা আর বাড়ীঘর দেখতে লাগল না বিমলের কথা ভাবতে লাগল তা একমাত্র সে-ই বলতে পারে।

আট

রোজ সকালে বিমলকে ডাক্তারখানায় যেতে হয়—বাবার ওষুধ আনতে।

রত্নেশ্বর জেদ ধরে বসেছেন—এ্যালাপ্যাথি ওষুধ তিনি খাবেন না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে হবে।

বিমলের ধারণা—তাঁর এ জেদ শুধু এ্যালাপ্যাথি ওষুধের খরচ বেশি বলে।

সে যাই হোক বিমলকে হোমিওপ্যাথি-ডাক্তারের সন্ধান করতে হয়। সন্ধান করতে হয় এই জন্য যে, বিমল জানে—হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা খুব সহজ চিকিৎসা নয়। যাঁরা এই শাস্ত্রটিকে খুব সহজ করে তুলেছেন তাঁরা এই দুঃসাধ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুই জানেন না—এই তার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকাতা শহরে হোমিওপ্যাথের অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ক'জন এই বিদ্যাটিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছেন—বাইরে থেকে কিছুই জানবার উপায় নেই।

একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে বিমল একদিন একজন খুব নাম করা হোমিওপ্যাথের সন্ধান পেল।

একদিন সে গেল তাঁর ডাক্তারখানায়। গিয়ে শুনল, রোগীর বাড়ী যেতে হলে তিনি ষোল টাকা নেবেন।

এই ষোলটি টাকা দেবার সাধ্য তখন তার ছিল না, তাই সে চুপচাপ ফিরে এলো সেখান থেকে।

ফিরে এসে বসলো একটা পার্কের বেঞ্চির ওপর।

কাজের সন্ধান সে করছে, অথচ পাচ্ছে না। দুটিমাত্র ছাত্রকে পড়ায় সে। তার জন্য যা পায় তাইতে তার সংসার চলে। সংসার ছোট বলেই চলে। বড় হলে চলত না।

কিন্তু বাপের অসুখের চিকিৎসা করাবার সামর্থ্য যার নেই, তার মনের শান্তি কোথায়?

অর্থ উপার্জন করবার অনেক পথ খোলা আছে মানুষের জন্যে। কিন্তু সব পথ সবার জন্য নয়। তার নিজের পথটি সে খুঁজে বের করতে পারছে না—এইটিই তার দুর্ভাগ্য।

তবে একদিন সে-পথ সে পাবেই এই তার বিশ্বাস।

আপাততঃ তার মত বেকারের সংখ্যা অনেক—এটিও তার সান্ত্বনা।

কিন্তু বৃদ্ধ পিতার চিকিৎসা করতে অক্ষমতার কোনও সান্ত্বনা নেই।

বিমল পার্ক থেকে উঠল। আবার গেল সেই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের বাড়ী।

এবার ডাক্তারবাবু তাঁর নীচের ঘরে এসে বসেছেন। বিমল তাঁর কাছে গিয়ে বসলো। বলল, নমস্কার!

দেখুন, আপনি একজন নাম-করা ডাক্তার। আমি এসেছি আপনার কাছে এই কথা বলতে যে, আমার বুড়ো বাবা অসুখে ভুগছেন। তাঁর ইচ্ছা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান। অথচ আপনাকে ষোলো টাকা ভিজিট্ দেবার সাধ্য আমার আপাততঃ নেই। এখন আপনি যদি ভিজিট না নিয়ে আমার বাবার চিকিৎসা করেন, আপনি বিশ্বাস করুন, মাসের শেষে আমার টিউশনির টাকা পেলে আপনার প্রাপ্য যা হবে তা আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো।

ডাক্তারবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

'হুঁ' বলে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না। ধারে চিকিৎসা আমি করি না।

বিমলের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোতে চাচ্ছিল না, তবু বলল; আপনি বিশ্বাস করতে পারলেন না আমাকে? আমি আপনার

কাছে দয়া ভিক্ষা করছি না। কারণ আমি জানি ভিক্ষা করে দয়া পাওয়া যায় না। আমি শুধু চাইছি একটুখানি—

সুবিধা সুযোগ। ডাক্তারবাবু কথাটা তার শেষ করে দিলেন। তারপর বললেন, আমার সময় নষ্ট করো না। আমার সময়ের অনেক দাম। তুমি যাও। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

বিমল চলে এলো সেখান থেকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যেমন করে হোক, একজন হোমিওপ্যাথি-ডাক্তার সে নিয়ে যাবেই।

কলকাতার রাস্তায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটি হোমিওপ্যাথি দোকানের দিকে তার নজর পড়লো।

ঢুকল সেই দোকানে।

জিজ্ঞেস করল, এখানে কোনও ডাক্তার বসেন না?

সুমুখে যিনি বসেছিলেন, তিনিই বললেন, বলুন—আমিই ডাক্তার।

দেখলে কিন্তু ডাক্তার-ডাক্তার মনে হয় না মানুষটিকে। বিমল তবু বলল, আপনি যদি একজন রুগী দেখতে যান আমার সঙ্গে, আপনাকে কত দিতে হবে?

ডাক্তারবাবু বললেন, এখানে যদি নিয়ে আসেন রুগীকে, তাহলে কিছুই দিতে হবে না। শুধু ওষুধের দাম দেবেন। আর যদি আপনার সঙ্গে যেতে হয় তো দেবেন চার টাকা।

বিমল বলল, এখুনি আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

কতদূর যেতে হবে?

তা একটু দূর আছে।

গাড়ী ডাকুন একটা।

গাড়ী ডাকতে পারব না। আমার কাছে আছে মাত্র পাঁচটি টাকা। আপনার ওষুধের দামও তো দিতে হবে।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চলুন, ট্রামেই যাচ্ছি।

সেই ডাক্তারকেই নিয়ে এলো বিমল। কতক ট্রামে চড়ে কত হেঁটে।

কিন্তু আশ্চর্য। বেশি বয়স নয় ডাক্তারের। বিমলের চেয়ে দু' একবছরের বড়ই হবে হয়ত। প্রথমে দেখে যাকে ডাক্তার-ডাক্তার মনে হয়নি, তার ব্যবহার দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ট্রামে চড়ে ডাক্তারবাবু নিজে পয়সা দিয়ে দুজনের টিকিট কাটতে চাইলেন। বিমল কিছুতেই যখন কাটতে দিল না, ডাক্তারবাবু তখন হেসে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি আপনার অবস্থা। তাই টিকিটের দামটা দিতে যাচ্ছিলাম।

বিমল বলল, আমি তা নেবো কেন? অবস্থা আমার যতই খারাপ হোক।

ভাল। ভাল। মানুষের আত্মসম্মানবোধ থাকা দরকার।

তারপর কথায় কথায় পরিচয় হলো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। নাম—শরৎ সরকার। তাঁরা তিনপুরুষ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। তার ঠাকুর্দা প্রথম এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন না তিনি। বই পড়ে পড়ে ডাক্তার হয়েছিলেন, কিন্তু এই শাস্ত্রে অসাধারণ ছিল তাঁর জ্ঞান। ভিজিট ছিল একটি টাকা, আর ওষুধের দাম ছিল চারটি পয়সা। এত রুগী আসতো যে তিনি নাইবার খাবার অবসর পেতেন না। বেঁচেছিলেন আশী বছর। কলকাতা শহরে হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস্ করে তিনি বাড়ী করে গেছেন, ওষুধের এই দোকানটি করেছেন।

এই পর্যন্ত বলে শরৎ সরকার একটুখানি থামলেন। থেমে আবার বললেন, তারপর আমার বাবা হলেন ডাক্তার। আমি তাঁর একটিমাত্র ছেলে। বি-এ পাশ করবার পর কি করবো ভাবছি, বাবা বললেন, পৈতৃক ব্যবসা তুলে তো দিতে পারি না, তুইও ডাক্তারী করবি।

আমাকে ঢুকিয়ে দিলেন হোমিওপ্যাথি কলেজে আর সঙ্গে

সঙ্গে রাখতে লাগলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, বাবা বেশিদিন বাঁচলেন না, আমাকেই ডাক্তার হয়ে দোকানে এসে বসতে হলো সেই থেকে ডাক্তারী করছি।

বিমল জিজ্ঞেস করল, আপনার ঠাকুর্দার ছিল এক টাকা দক্ষিণা, আপনার চার টাকা, আপনার বাবার দক্ষিণা কত ছিল?

ডাক্তার সরকার বললেন, আমার বাবা ছিলেন সন্ন্যাসীর মত মানুষ। ঠাকুর্দা টাকাকড়ি অনেক কিছু রেখে গিয়েছিলেন, আর বলে গিয়েছিলেন টাকা রোজগার করবার জন্য ডাক্তারী করো না, রোগীকে নিরাময় করবার জন্য ডাক্তারী করো। তাই আমার বাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রুগীর কাছ থেকে একটি পয়সাও নিতেন না। রুগীরা ভাল হয়ে গিয়ে নিজেরাই টাকা দিয়ে যেতো। বাবা খুব ভাল চিকিৎসক হয়েছিলেন, আমি সেরকম হতে পারিনি।

বিমল একটু রসিকতা করে বলেছিল, তাই বুঝি আপনার দক্ষিণা —চার টাকা?

ডাক্তার সরকার হেসেছিলেন।

—চার টাকা বলি। কিন্তু দিতে যদি কেউ না পারে, চারটে পয়সাও নিই না তার কাছ থেকে। আজকালকার মানুষগুলো দিন-দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। রুগীর কাছ থেকে ভিজিটের টাকা যদি না নিই, ভাবে ব্যাটার চলে না' তাই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে।

ডাক্তার সরকার চমৎকার মানুষ। বিমলের বাবাকে দেখেছেন। ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন, একেবারে শেষ করে এনে আমাকে ডেকেছেন।

জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার বাবার বয়স কত?

বিমল বলেছে, পঁচাত্তোর।

এখন আর তাঁর যৌবন আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না। শুধু

চেষ্টা করব তিনি যাতে শান্তিতে থাকেন, কোনোরকম কষ্ট যেন তাঁর না হয়।

বিমল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

গত কয়েকদিন থেকে একটি কাজের সন্ধানে বিমলকে খুব ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সকালে ছেলে পড়িয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে বাবাকে ওষুধ খাইয়ে নিজে তাড়াতাড়ি স্নানাহার করে সেই যে সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এলো সন্ধ্যার পরে।

এসেই জামাকাপড় না ছেড়ে বিমল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-পড়ল বিছানার ওপর।

গায়ত্রী আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল জিজ্ঞেস করল, শুয়ে পড়লি যে?

খুব ঘুরেছি, আজ একটু পরে খাব দিদি, কেমন?—এই বলে খাটের উপর শুয়ে পড়ে, সে একবার তার দিদির মুখের পানে তাকাল।

ঘরটা অন্ধকার হলেও খোলা জানলার পথে ঘোলা জ্যোৎস্নার খানিকটা আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে, সেই ম্লান আলোকে গায়ত্রীর আনত মুখের অর্ধেকখানা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। গত কয়েকদিন হতে উপর্যুপরি রাত্রি জেগে সে বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার সেবা করেছে, তার ওপর সংসারের যাবতীয় কাজ নিজে করেছে, বিশ্রাম করবার এতটুকু সময় সে পায় নি,—তাই তার শান্ত সুন্দর মুখের ওপর ক্লান্তি এবং অবসাদের যে রুক্ষ মলিনতা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, আজ এই অতর্কিত মুহূর্তে সবার আগে সেটা লক্ষ্য করে বিমলের দৃষ্টি যেন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উঠল। কিন্তু বলবার মত কোন কথাই সে খুঁজে পেলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে সে তার ব্যথিত দৃষ্টি সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পরে আলোটা জেলে টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে গায়ত্রী শয্যার এক পাশে এসে বসল। ধীরে ধীরে তার রুক্ষ চুলগুলোর

উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, ঘুরে ঘুরে কেমন চেহারা হয়েছে দেখেছিস ? বলি হ্যাঁরে, বাঁচতে হবে, না, না ?

বিমল সে-কথার কোনও উত্তর দিল না। স্থির নির্বিকারভাবে ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, ভাত বাড়গে যাও, অনেক রাত হয়েছে।—এই বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে জোর করে উঠতে যাচ্ছিল, গায়ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলল, না রাত হয়নি, আর একটুখানি জিরিয়ে নে।

বাধ্য হয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। গায়ত্রী বলল, কাল থেকে এত করে আর ছুটে বেড়াসনে বিমল। পায়ে খুব ব্যথা হয়েছে, না রে ?

বিমল বলল, না।

তাই আবার না হয় কখনও ?—বলে গায়ত্রী একটুখানি পিছিয়ে গিয়ে বিমলের একখানা পা একেবারে তার কোলের ওপর টেনে এনে বলল, হাত বুলিয়ে দি, তুই চুপ করে শুয়ে থাক।

বিমল তার পা দুটো জোর করে সরিয়ে নিয়ে প্রবল [illegible] মাথা নেড়ে বলে উঠল, না, না, না দিদি, তোর পায়ে পড়ি, না—

গায়ত্রী মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বলল, দিদি বলে অপরাধ [illegible] কিচ্ছু হবে না, শেষে না হয় খুব ভক্তি করে একটা প্রণাম [illegible]। —এই বলে সে আর কোন কথা না শুনে বিমলের একখানা পা তার কোলের ওপর তুলে নিয়ে টিপে দিতে লাগল।

বিমল আর কোন প্রতিবাদ করল না। দাঁতে দাঁত চেপে বালিশে মুখ গুঁজে সে চুপ করে পড়ে রইল।

মিনিট-দশ পরে বিমল যেন তার এ সেবা আর সহ্য করতে পারল না, পা দুটো সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল, হয়েছে। আমার ক্ষিদে পায় নি ?

গায়ত্রী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে নিজের পায়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, কই প্রণাম করলি নি যে ?

বিমল তার দিদির এই হাস্য-করুণ মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু।

হ্যাঁ, এবার লজ্জা করবে বই কি! আয়, আমার ঘরে বসেই খাবি আয়। এ ঘরে আর এঁটো তুলব না।—বলতে বলতে গায়ত্রী বের হয়ে গেল।

—পাশের ঘরে বিমলের সামনে ভাতের থালা ধরে দিয়ে গল্প করবার জন্য গায়ত্রী তার কাছে এসে বসল। কিন্তু গল্প সে করতে পারল না।

দিনে দিনে তাদের দারিদ্র্য যে কিরূপ উৎকট হয়ে উঠছে এবং তার ইঙ্গিত যে এই অপ্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জনের মধ্যেও কত বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিমলকে তার চোখের সুমুখে খাওয়াতে বসে সেই কথাটাই গায়ত্রী যেন আজ ভাল করে উপলব্ধি করল এবং গল্প করা দূরে থাক্, এখান থেকে এসময়ে তার মনে হতে লাগল একটু আড়ালে চলে যেতে পারলেই বাঁচে। তার মৌন অবনত মুখখানির দিকে [illegible] একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমলেরও সে কথা বুঝতে [illegible] হলো না। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যেকার এই [illegible] মৌনতা হঠাৎ কি কথা দিয়া যে সে ভেঙ্গে ফেলবে বিমল [illegible] তা ভাল বুঝতে পারল না, অথচ এমন ভাবে চুপ করে থাকাও চলে না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে ঈষৎ হেসে বিমল বলল, আজ ভারি একটা মজা হয়েছে দিদি!—

গায়ত্রী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! কি মজা রে?—বলে বিমলের মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

বিমল বলল, তুই লিফ্‌ট্ কেজ্ (lift cage) দেখিসনি, নয়? আফিসের বড় বড় সাত আট তলা বাড়ীগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে বড় কষ্ট হয় কিনা, তাই ইলেকট্রিকের এক রকম খাঁচার মত ঘর থাকে, তিন চারজন লোক তার ভেতরে দাঁড়াতে পারে,—লোকেরা তার ভেতরে উঠে দাঁড়ায়, আর সেইটাই বারে-বারে ওপর-নীচে ওঠা

নামা করে। অনেক উঁচুতে যাদের উঠতে হয়, তাদের আর কষ্ট করে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। আমাদের এই বাড়ীটা যদি পাঁচ তলা কি ছ তলা, কি ধর্ সাত তলাই হতো—

গায়ত্রী হাসল। বলল, আমাদের এটা আর ছ-সাত-তলা হয়ে কাজ নেই। বুঝেছি, বল্।

বিমলও ঈষৎ হাসল; কিন্তু একটা দুঃখের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অপরকে হাসাবার জন্য যে-হাসি, তাতে প্রাণ থাকে না, বিমল তা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেও সহসা তার হাসি বন্ধ করে গম্ভীর হতে পারল না। তেমনি সহাস্য মুখেই বলতে লাগল, আজ একটা আফিসে গিয়ে ঢুকেছি,—দেখি লিফ্‌ট্ কেজের সুমুখে একজন থুরথুরে বুড়ো, সাদা একটা হাতকাটা পিরাণের ওপর ময়লা একটা চাদর জড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে,—খুব রোগা আর একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে বেচারা। মুখখানা দেখলেই দয়া হয়। কেজের সুমুখে যে দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল অনেক কষ্টে সে ভয়ে ভয়ে তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে, তাকে একটি প্রণাম করে বলল আমি পাঁচতলায় যাব চাপরাশী-সাহেব, আমাকে ওই ওতে করে তুলে দেবেন?

ইয়া গালপাট্টাওয়ালা চাপরাশীটা তখন টুলের ওপর বসে বসে খইনি তৈরি করছিল। প্রথমে সে কোনও কথাই বলল না। উত্তরের আশায় বুড়ো লোকটি তখন থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। তারপর খইনিটা সে মুখে পুরে দিয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ করে এমনভাবে থুথু ফেলল, একটুখানি সরে না দাঁড়ালে ভদ্রলোকের জামার উপরেই পড়ে আর-কি! এবার তার কথা বলবার ফুরসুৎ হলো। বাঁ হাত দিয়ে গোঁপ-জোড়াটা বেশ করে পাকিয়ে নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো, ইয়ে লীফোট্ তুমারা বাস্তে নাহি হ্যায়, উধার যাও!—বলে সে তাকে ওপরে উঠবার সোজা লম্বা সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলে। আরও ক'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেখানে

দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের ফেলে রেখে একজন সাহেব গট গট করে লিফটে চড়ে বসতেই কেজটা সর সর করে ওপরে উঠে গেল। সাহেব ওপরে উঠে গেল। সে বেচারা বুড়ো তখন একবার কেজের দিকে আর একবার লম্বা সিঁড়িটার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল দিদি, যে দেখলেই হাসি পায়।—বলে বিমলও বেশ জোরে-জোরেই হাসতে গেল, কিন্তু পারল না।

গায়ত্রী বলল, পাড়া-গাঁ থেকে নতুন কলকাতায় এসেছে বোধ হয়?

তাই হবে।—বলে খাওয়া শেষ করে বিমল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

গায়ত্রীকে তার সর্বনাশা চিন্তা থেকে বিরত করবার জন্যই সে যা-তা একটা হাসির কথা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তার সে-উদ্দেশ্য কতখানি সফল হলো কে জানে। নিতান্ত অনাবশ্যক এই গল্পের অবতারণা করে হয়ত-বা তার মনটাকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলল।

শোবার ঘরে গিয়ে বিমল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, দিদি, তুই খেয়েছিস?

রাত্রে আমি খাই? জানিস নে?—বলেই কথাটাকে উড়িয়ে দেবার জন্য সে যেরমকভাবে হেসে উঠল, সে হাসি দেখলে কান্না পায়।

বিমল তার চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে এনে একখানা বই খুলে চুপ করে বসল। গায়ত্রী তার খাটের বিছানাটা ভাল করে পেতে দিচ্ছিল। বলল, আমি ভেবেছিলুম, নিভা ভারী অহঙ্কারী মেয়ে।

বিমল কেমন যেন অন্যমনস্কের মত বই-এর পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলল, হুঁ।

গায়ত্রী আবার বলল, ভেবেছিলুম, যেদিন দেখা হবে, আমি

আচ্ছা করে তাকে শুনিয়ে দেব,—তোর জুতো ফেলে দেওয়া আমি বার করব।

বিমল নতমুখে বই-এর ওপর চোখ রেখেই হাসতে লাগল।

হাসি নয়, আমি ঠিক জব্দ করতুম, কিন্তু দেখলুম, সে বড় ভাল মেয়ে! অমরেশ আর বিভাকে দেখেই আমি তা বুঝেছিলুম।

বিমল তেমনিভাবে মুখ না ফিরিয়েই ধীরে ধীরে বলল, কেমন করে জানলি? কথা ত তার সঙ্গে একটিও কোস্ নি?

দরকার হয় না। দেখলেই চেনা যায়। আর, এমনি অসময়ে দেখা হলো ছাই, না পারলুম দুটো কথা কইতে, না পারলুম আলাপ-পরিচয় করতে। আর একদিন তাদের আসতে বলিস কেমন?

প্রত্যুত্তরে বিমল ঈষৎ হেসে বলল, তোর এ ভাঙ্গা বাড়ীতে সে রোজ রোজ আসবে কেন রে?

গায়ত্রী বলল, মেয়েদের কি সে অভিমান সাজে কখনও? গরীবের ঘরে যদি তার বিয়ে হয়, যেতে হবে না?

বইখানা বিমল মনে-মনে পড়তে পড়তে বলল, হ্যাঁ, গরীবের ঘরে বিয়ে সে করবে কি না? শাড়ী-ব্লাউসের দাম দিতেই ত বেচারার ভিটেয় ঘুঘু চরবে!

কথাটা শুনে গায়ত্রী যেরকম করে হাসল, দেখে মনে হলো যেন সে-সব বিশ্বাস্ করে না। বিছানার ওপর চাদরখানা বিছিয়ে দিয়ে বলল, কাল যদি যাস,—বলিস, দিদি বলেছে, তুমি একবার যেয়ো।

বলব।—বলে বিমল আবার জোর করে পড়ায় মন দিল।

দরজটা বন্ধ করে দিয়ে ঘর থেকে বের হবার সময় গায়ত্রী বলে গেল, বেশি রাত জাগিসনে, বই বন্ধ করে শুয়ে পড়।

বিমল বইও বন্ধ করল, শুয়েও পড়ল, কিন্তু চোখে তার আজ সহজে ঘুম এল না বলে রাত্রি তাকে জাগতেই হল। খোলা

জানলার বাইরে চাঁদের আলো সাদা কাপড়ের মত ধব-ধব করছিল। বাড়ীর পাশে আগাছায়-ভর্তি যে জায়গাটা পড়েছিল, তারই সেই ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কোথাও বোধ করি নাম-না-জানা কোনও বুনো-ফুল ফুটেছে, শীতের বাতাসে রয়ে রয়ে কেমন যেন একটা তীব্র-মধুর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। কিছু দূরে একটা মস্ত বড় পোড়োবাড়ীর ভাঙ্গা ছাদ ও সিঁড়ির ওপর জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে। কিন্তু এই আগাছার জঙ্গল, জনহীন ভাঙ্গা বাড়ী ও ইঁটের গাদার মধ্যে দেখবার মত কিছু না থাকলেও, বিছানার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে বিমল অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইল এবং শীতের রাত্রেও ঘণ্টা দুই তিন ধরে চোখে তার ঘুম এলো না।

প্রতিদিনের নিয়মমত পরদিন সকালেই বিমল ডাক্তারখানায় গেল। রামধনি-চাকরটাকে সে দিন-দুই-তিন আগে বিদায় করে দিয়েছিল; আজ আবার ডাক্তারখানা থেকে ফিরে এসে দেখল, সে এসে হাজির হয়েছে। বিমল জিজ্ঞেস করল, কিরে তুই আবার এলি যে?

রামধনি বলল, ফিন ভেজলেন হামাকে বাবু।

বিমল যেন একটুখানি রুক্ষ কণ্ঠেই বলে উঠল, না, না, ভেজা-ভেজি আর দরকার নেই বাপু,—তুই যা।

অমরেশের বাড়ীর চেয়ে কাজে ফাঁকি দেবার সুবিধা এইখানেই বেশি। চাকরটা নড়তে চাচ্ছিল না।

বিমল আবার কি-একটা কথা তাকে বলতে যাচ্ছিল, ঘরের ভেতর থেকে গায়ত্রী বলে উঠল, ছি বিমল, ও কি করছিস তুই? ওকে তাড়াচ্ছিস কেন? অমরেশ কি ভাববে বলত?

না, না, কিছু ভাববে না,—ওরে তুই যা। বিমল রামধনিকে চলে যাবার ইঙ্গিত করল।

রামধনি বলল, আভি?

হাঁ আভি—বলে বিমল তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং জানলাটা খুলে দিয়ে তার সুমুখে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল।

বিমল।

ডাক শুনে পিছন ফিরতেই দেখল, গায়ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে। বিমল জিজ্ঞেস করল, ও গেল?

গায়ত্রী বলল, হ্যাঁ, গেল। কিন্তু এ কি পাগলামি তোর বিমল? অমরেশ কাল আসেনি, আজ দুপুরে সে নিশ্চয়ই আসবে, তুই তখন থাকবি নে, আমি কি জবাব দেব বল্ ত?

বিমল বলল, অনর্থক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি দিদি?

গায়ত্রী ঈষৎ হেসে বলল, পাগল! কেউ যদি ভালবেসে তোর সাহায্য করতে আসে, সেটাও কি ঋণ বলে ধরতে হবে নাকি?—তার চেয়ে তুই একটি কাজ কর্, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, আজ খেয়ে যখন বেরিয়ে যাবি, ওই পথে অমরেশের বাড়ী হয়ে যা! একদিনও তোর সঙ্গে তার দেখা হয় না—কত দুঃখু করে।

বিমল চুপ করে রইল।

চুপ করে রইলি যে? কি, ভাবছিস কি?

বিমল বলল, কিছু ভাবিনি, যাব।

গায়ত্রী বলল, হ্যাঁ যাস। যে ভালবাসে তাকে কষ্ট দিতে নেই।

বিমল বলল, বাজার যেতে হবে ত? পয়সা-কড়ি কিছু আছে?

নিশ্চয়ই আছে। আমায় কি তেমনি ম্যানেজার পেয়েছিস নাকি? আয় নিবি আয়!—বলে হাসতে হাসতে গায়ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিমলও বেরিয়ে যাচ্ছিল তার পিছু পিছু, হঠাৎ রত্নেশ্বরের ডাক শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

—ডাক্তার-সরকারকে কিরকম মনে হয় তোর?

বিমল ম্লান একটু হেসে বললে, সে কথা তো আপনি বলবেন। রুগীই বলবে ডাক্তার কেমন।

রত্নেশ্বর বললেন, ভাল। খুব ভাল। আমি বেশ ভাল আছি।

বিমল খুশি হলো কথাটা শুনে। নাম-করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার যেদিন এলেন না, বিমল সেদিন মরীয়া হয়ে গিয়ে ভেবেছিল যে-কোনও একজন হোমিওপ্যাথি-ডাক্তারকে ডেকে এনে বাবাকে দেখাবে। তাতে হয়ত তাঁর রোগের কোনও প্রতিকারই হবে না। হোমিওপ্যাথি দিয়ে চিকিৎসা করবার সাধটি মিটবে শুধু।

বিমল ভেবেছিল—এ-বয়সে রোগ একেবারে নিরাময় হয়ত-বা হয় না, কিন্তু তাঁকে রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার সাধ্যটুকু পর্যন্ত তাব নেই। নিজেব জীবনকে সেদিন সে ধিক্কার দিয়েছিল। ধিক্কার দিয়েছিল নিজের দেশকে। দেশের বিধি-ব্যবস্থাকে।

লেখাপড়া যদি সে না শিখত, যদি সে রুগ্ন হতো, অকর্মণ্য হতো তাহলেও-বা ভাবতে পারতো—তার এই বেকারত্বের জন্য সে নিজে দায়ী। কিন্তু তা যখন নয়, তখন সে তার এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করবে কাকে?

অনেকে অদৃষ্টকে দায়ী করে। কিন্তু বিমল তার অদৃষ্টকে দায়ী করতে নারাজ। সে দায়ী করে নিজের চরিত্রকে, নিজের আত্ম-সম্মানবোধকে।

বিমল চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে। ডাক্তার-সরকার ভাল ডাক্তার এবং তিনি ভাল চিকিৎসা করেন এই কথাটিই সে শুনতে চেয়েছিল।

বত্নেশ্বর আবার ডাকলেন। বললেন, আজ একটা কাজ করিস তো বাবা!

—কি কাজ?

রত্নেশ্বব চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর আবার শুরু হলো তাঁর বিড় বিড় করে আপনমনেই বকে যাওয়া। অস্পষ্ট-ভাবে কি যে তিনি বলেন কেউ বুঝতে পারে না।

বকা শেষ হলে তিনি চোখ খুলে চাইলেন। ঠোঁটদুটো একবার

থর থর করে কেঁপে উঠলো, চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো, তারপর নিতান্ত অসহায় শিশুর মত ঘাড় নেড়ে বললেন, ভুলে গেছি।

মনে করুন, আমি বেরোবার সময় জেনে যাব।

এই বলে বিমল গায়ত্রীর কাছে পয়সা নিয়ে বাজারে চলে গেল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় স্নানাহার করে বিমল বের হয়ে যাচ্ছিল, রত্নেশ্বর ডেকে বললেন, আজ একখানি উৎকৃষ্ট গীতা আমার জন্যে কিনে আনিস ত বাবা।

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ
অর্ধ মাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্বাচ্যপদাত্মিকা।
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্
বেদত্রয়ী পরা নন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞান সংযুতা।

জানিস ত বিমল? আহা, গীতা! গীতা! আনিস বাবা একখানা।

আনব। তখন কি এই কথাই বলছিলেন?

কখন বাবা?

সেই যে তখন ভুলে গেলেন?

তা হবে।—বলে রত্নেশ্বর চুপ করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

বিমল চলে গেল। গীতা আজ তাকে আনতেই হবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে দিদির কথামত সে অমরেশের বাড়ীর দিকেই চলতে লাগল।

অমরেশের প্রকাণ্ড বাড়ীটার দরজায় গিয়ে সে চুপ করে দাঁড়াল, কিন্তু ভিতরে ঢুকলো না। হঠাৎ কি ভেবে সে যেমন এসেছিল আবার তেমনি বিপরীত মুখে হন হন করে দ্রুতপদে হাঁটতে শুরু করে দিল। উপরের দিকে একবার সে ফিরেও তাকাল না, তাকালে হয়তো দেখতে পেত, নিভা তখন সুমুখের জানলার পাশে

দাঁড়িয়েছিল। দেখতেও সে পেয়েছিল। ভেবেছিল হয়ত আবার সে ফিরে আসবে। কিন্তু অনেকক্ষণ তার আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন দেখল বিমল আর এলো না, তখন সে রাগে অভিমানে জানলার কপাটদুটো এত জোরে বন্ধ করল যে বিভা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হলো দিদি ?

কিছু হয়নি।

বিভা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু নিভার সে গম্ভীর মুখখানা দেখে কিছু বলতে তার আব সাহস হলো না। ছুটে পালাল সেখান থেকে।

নয়

অমরেশের দরজা থেকে ফিরে পাশেই একটা গলির ভেতর বিমল ঢুকে পড়ল। কদর্য একটা সঙ্কীর্ণ গলি—দুদিকে খোলার বস্তি। দেখলে একটা ঘরেব দরজায় বিস্তর লোক জড় হয়েছে। পাশের একটা খোলার ঘরেব ভেতর কি যেন একটা হাঙ্গামা বেধে-ছিল,—মনে হলো কতকগুলো মেয়ে যেন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দেখতে দেখতে লাল-পাগড়িওয়ালা জন-দুই পুলিশ-কনেষ্টবল, আলুলায়িতকেশা উলঙ্গপ্রায় একটা মেয়েকে টানা-হেঁচড়া করে ভিড় ঠেলে ঘরের ভেতর থেকে একেবারে বাস্তার ওপর এনে ফেলল। মেয়েটার এক অপরিচিত প্রেমাস্পদ নাকি তার মুখের ওপর এ্যাসিডের শিশি ছুঁড়ে দিয়ে তার অলঙ্কার-পত্র সমস্তই কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে। চোখদুটো বন্ধ। কিছুই সে বোধকরি দেখতে পাচ্ছে না। যেখানেই এ্যাসিড পড়েছে সেইখানেই দগদগে ঘা হয়ে গেছে। গয়না কাড়তে গিয়ে মেয়েটার নাক-কান ছিঁড়ে দিয়ে রক্তে তার কাপড়-চোপড় ভাসিয়ে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে মেয়েটা ছট্‌-ফট্ করছিল। আরও জন-কতক মেয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে করতে পথের ওপর এসে দাঁড়াল। ব্যাপার যে ঠিক কি হয়েছে ভাল বুঝতে পারা গেল না। অর্থের জন্য এমন অনর্থপাত পথে-ঘাটে নিত্য কতই-না ঘটছে। পথে দাঁড়িয়ে এই কৌতুক দেখবার অবসর বিমলের ছিল না। তাড়াতাড়ি পথটা সে পার হয়ে একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। ট্রামগাড়ীগুলো লোকে লোকে ঠাসা। বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে কেরাণীরা বোধ করি আপিসে চলেছে। বিমলের নজর ছিল ফুটপাথের পাশে মোটা মোটা ইলেকট্রিকের খুঁটিগুলির দিকে। এদেরই গায়ে-মারা হাতে-লেখা

একটা বিজ্ঞাপন দেখে ছেলে-পড়ানোর কাজটি সে পেয়েছিল। খবরের কাগজগুলোকে বিশ্বাস হয় না। যে-সব বিজ্ঞাপন তাতে বেরোয়, অধিকাংশই পোষ্টবক্সের নম্বর দেওয়া—দরখাস্ত করতে পয়সার প্রয়োজন, অথচ উত্তর পাবে না জানা কথা। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ একটা থামের বিজ্ঞাপনের দিকে তার নজর পড়ল। নব-প্রকাশিত পুস্তক, কেশ তৈল এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজের বিজ্ঞাপনের পাশে একটা ছোট কাগজে লেখা ছিল—Wanted a tutor in History —এই পর্যন্ত পড়েই তার আর পড়বার প্রয়োজন হল না। কারণ, এর আগে তারই মত হয়ত-বা কোনও দুর্ভাগার নজরে এটা পড়েছিল। পাছে আর-কেউ ঠিকানাটা জানতে পেরে সেখানে গিয়ে হাজির হয়—এই ভয়ে দয়া করে সে তার ঠিকানা এমন-কি রাস্তার নামটি পর্যন্ত পেন্সিল দিয়ে এমনভাবে হিজিবিজি কেটে নষ্ট করে দিয়েছে যে তার পাঠোদ্ধার করা মুস্কিল।

বিমল নিজের রাস্তা ধরল। প্রায় মাইল-দেড়েক পথ অনর্থক হেঁটে এসে দেখল, একটা ছাপাখানার দরজায় একটা কাগজের উপর লেখা রয়েছে,—একজন রীডার চাই। বিমল ধীরে ধীরে সেইখানেই ঢুকে পড়ল। কম্পোজিটাররা কাজ করছিলেন, জিজ্ঞেস করতেই একজন বলে দিলেন, ওই-যে সাতাশ-নম্বরে আমাদের বই-এর দোকান, সেখানে বড়বাবু আছেন, জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

তিন-চারখানা বাড়ীর পরেই বই-এর দোকান। চারদিকে আলমারি ভরা বই, সুমুখে বসে বড়বাবু বোধকরি খাতা লিখছিলেন, পাশে একটা বেঞ্চির ওপর আর-একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বিমল ধীরে ধীরে সেই বেঞ্চের একধারে গিয়ে চুপ করে বসল। বড়বাবু মুখ তুলে একবার চেয়েও দেখলেন না।

কিছুক্ষণ পরে খাতার ওপর মুখ রেখেই বড়বাবু বললেন, আপনার নভেলখানা আমি পড়েছি, তেমন সুবিধে হয় নি। আচ্ছা, কপিরাইট কত হলে দিতে পারেন?

বিমলের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, কপিরাইট? কপিরাইট মানে একেবারে চিরকালের জন্যে বইএর সর্বসত্ব আপনাকে দিয়ে দেওয়া তো?

প্রকাশক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। সব ঝামেলা মিটে যাবে।

তার জন্যে আপনি আমাকে কত টাকা দেবেন? গ্রন্থকার জিজ্ঞেস করলেন।

প্রকাশক বললেন, আপনার নাম-টাম থাকলে আপনাকে দুশো আড়াইশো টাকা দিতাম। কিন্তু তেমন নাম যখন এখনও আপনার হয়নি, আপনাকে দেবো নগদ একশো টাকা।

গ্রন্থকার চোখ দুটো বড় বড় করে প্রকাশকের দিকে তাকালেন। অবাক হয়ে গেছেন তিনি।

অবাক হবেন না। এই আমাদের বইএর বাজারের নিয়ম।

এই বলে প্রকাশক আরও কিছু উপদেশ দিলেন তাঁকে। বললেন, একটা কথা জেনে রাখুন আমার কাছে। আপনার উপকার হবে। হয়ত আমার কাছে কপিরাইট দেবার ভয়ে বইখানি নিয়ে গিয়ে আপনি দিলেন একজন নামকরা প্রকাশকের হাতে। প্রথমত তাঁরা নিতেই চাইবেন না, যদি-বা নেন, একশ টাকার বেশি দেবেন না। তারপর বলবেন হাজার বই ছাপবো, আসলে কিন্তু ছাপবেন চার হাজার। সে হলো গিয়ে কপিরাইটের বাবা। জীবনে আর সে বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ হবে না। তার ওপর ওই একশোটি টাকা আদায় করতে আপনার দুজোড়া জুতো ছিঁড়ে যাবে।

গ্রন্থকার বললেন, সর্বনাশ! এই কি আপনাদের নিয়ম নাকি? সব প্রকাশকই এইরকম?

প্রকাশক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। এইজন্যেই তাঁরা বইএর ব্যবসাতে নেমেছেন অন্য ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে। দু' একজন মাত্র ভাল মানুষ আছেন—মাত্র দু' একজন।

গ্রন্থকার বললেন, বইএর বাজারে এই জোচ্চুরি তো ভাল নয়

সব বাজারেই জোচ্চুরি আছে, বইএর বাজার কি দোষ করল ? এখানেই-বা জোচ্চুরি থাকবে না কেন ?

অথচ আমাদের বাংলা দেশ, বাংলা সাহিত্য—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে দিলেন না প্রকাশক। বললেন, আরে রাখুন মশাই ও-সব ভাল ভাল কথা। ও-সব বইএ লেখা থাকে। আসলে আমরা হচ্ছি—চরিত্রহীন। আমাদের তাই এত বিপদ। এত ঝামেলা। দেশটা সুখে আছে বলতে চান ? যাকগে, আমরা মশাই, ঝক্কি-ঝামেলা ভালবাসি না, তাই সাফরাফ ব্যবসা করতে চাই। বলুন, কপিরাইট দেবেন তো দিন, নইলে কেটে পড়ুন।

এই বলে গ্রন্থকারের হাতে-লেখা কপিটি তিনি বের করতে যাচ্ছিলেন, গ্রন্থকার বললেন, রাখুন ওটা। আমাকে একটু ভেবে দেখবার সময় দিন।

সেই ভাল। আপনি ভাবুন। ভেবে কোনও কূল কিনারা পাবেন না, শেষে আমারই কাছে আসতে হবে—এই আমি বলে দিলাম। আসুন। নমস্কার। আর একজন লোক বসে আছেন—

এতক্ষণ পরে তিনি তাকালেন বিমলের দিকে।

জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই ?

বিমল বলল, প্রেসে আপনার একজন রীডার চাই লিখেছেন—

হ্যাঁ, চাই। কোন্ প্রেস থেকে আসছেন ?

কোনো প্রেস থেকে আসি নি।

প্রকাশক জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি বাড়ী থেকে আসছেন ?—প্রুফ করেক্ট করতে জানেন ?

কথাটা বিমল নিজেও এতক্ষণ ভেবে দেখেনি। ভেবেছিল, রীডার মানে শুধু পড়েই দিতে হয়। বলল, আজ্ঞে না, ও-সব জানি না।

প্রকাশক বললেন, তবে আর প্রুফ রীডারের চাকরী কেমন করে হয় বলুন ?

আমি জানতুম না।—বলে বিমল তাঁকে একটি নমস্কার করে উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, একখানা গীতার দাম কত ?

এইবার বড়বাবু হেসে বললেন, তাই বলুন যে, বই কিনতে এসেছেন। দিন আট আনা দিন।—এই বলে টেবিলের ওপর তিনি তাঁর ডান-হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলেন, ওহে রাজিবলোচন, একখানা পকেট-গীতা দাও ত এঁকে !

থাক দিতে হবে না।—বলে বিমল পেছন ফিরতেই বড়বাবু বলে উঠলেন, চার আনারও একটা কম-দামী আছে। সেটাও নিতে পারেন।

কি যে বলবে, কি যে করবে, বিমল কিছুই বুঝতে পারল না। যন্ত্রের মত তার মুখ দিয়ে যেন বের হয়ে গেল, কাল নিয়ে যাব, আজ পয়সা নেই।

বিমল তখন দরজা পার হয়ে এসেছে। বড়বাবুর মন্তব্যটা তার কানে এসে বাজলো। তিনি বলছিলেন, আমরা দান-খয়রাৎ করিনে। পয়সা চাই—

পথের ওপর দিয়ে বিমল অনেক দূর চলে এল। বড়বাবুর সেই শেষের কথাটা তখনও তার কানের কাছে ক্রমাগতই বেজে চলেছে—পয়সা চাই, পয়সা চাই—

এইটেই যে প্রাণ-ধারণের মূল মন্ত্র। বিমল একটা কথা জানতো, যে-মানুষ এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে, বেঁচে থাকা তার জন্ম-অধিকার। কিন্তু সে গর্ব যদি তার কোনোদিন ছিল ত ছিল, আজ আর নেই। আজ সেই বেঁচে থাকার অধিকার তাকে অর্জন করতে হবে। সব অধিকারই অর্জন করতে হয়। কিন্তু অর্জন করবার সব পথ আজ বন্ধ হয়ে গেছে। জন্ম-অধিকারটুকু মাত্র কথার

কথা হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। জীবনের একটা শর্ত আছে—জীবন যদি তুমি পাও তো সে জীবনটিকে তোমায় সযত্নে রক্ষা করে চলতে হবে। কিন্তু জীবনকে রক্ষা করতে হলে আজ তোমার চোখের সুমুখে বহু সমস্যা। সব চেয়ে বড় সমস্যা—অর্থ। অর্থ তোমাকে উপার্জন করতে হবে, নইলে অনর্থ ঘটবেই! বিমলের মনে হচ্ছিল,—এই যে রাস্তার লোকজন, এই মুটে, ঐ মজুর, এই ফিরিওয়ালা, এই তুমি, এই আমি—সকলের মুখে সেই এক প্রয়োজনের তাগিদ। অর্থ চাই! ঐ যে রাস্তার ধারে খোলার বস্তির সেই মেয়েটা এ্যাসিডে পুড়ে অন্ধ হয়ে গেল, সেও শুধু অর্থের জন্য সেই প্রবঞ্চক শত্রুকে কাছে ডেকেছিল বলেই! আবার দস্যুবৃত্তি করে মেয়েটাকে চিরজীবনের মত পথে বসিয়ে দিয়ে যে চলে গেল, সেও শুধু সেই এক প্রয়োজনে।

সুমুখে একটা রিকশা থেকে নামলো একটা কুমড়োপটাসের মত মস্ত মোটা লোক। রিকশাওলা গলদঘর্ম হয়ে গেছে তাকে টানতে টানতে। রিকশাওলা বুড়ো, তার ওপর কঙ্কালসার জীর্ণ দেহ।

লোকটা কিন্তু দুআনা পয়সার বেশি তাকে দেবে না। এই নিয়ে বচসা বাধলো। লোকটাও দুআনার বেশি দেবে না। রিক্সাওলাও ছাড়বে না।

দুজনেরই এক প্রয়োজন।

এরও চাই অর্থ। ওরও চাই।

দুজনকেই জীবন ধারণ করতে হবে। যেমন করে হোক জীবনকে রক্ষা করতে হবে।

বিমল আজ তার বাবার একটা সামান্য অনুরোধও রাখতে পারল না। এই গ্লানি যেন তাকে পুড়িয়ে মারতে লাগল। আট আনা দামের মাত্র একটি গীতা। হয়ত অমরেশের বাড়ী গেলে অনায়াসে সে তা পেতে পারত কিন্তু সারা দুপুরটা সে পথে-পথে ঘুরে বেড়াল তবু সে-রাস্তা দিয়ে চলতেও কি জানি কেন তার মন সরল না।

বিকালে আজ একটু সকাল-সকাল বিমল গেল প্রাইভেট টুইশনি করতে। সে এক ওস্তাদ ছেলে। পড়ার চেয়ে অন্য দিকেই তার ঝোঁক বেশি। অনেক চেষ্টা করেও বিমল তাকে বশ মানাতে পারছিল না। মাষ্টারমশাইকে দেখেই ছেলেটি বলল, আজ স্যার্ আপনি রাত্রে আসবেন, ক্লাবে আমাদের একটা মিটিং আছে, আমি চল্লুম এখন।

পাশের ঘর থেকে ছেলের বাবা সব শুনতে পেলেন।

ক্লাবে মিটিং আছে শুয়োর!

বলতে বলতে তিনি ছুটে এসে দাঁড়ালেন এ-ঘরে।

এসেই অতবড় ছেলের গালের ওপর ঠাস্ করে একটি চড় মেরে দিয়ে বললেন, ক্লাব! ক্লাব করা বেরোবে সেইদিন—যেদিন আমি মরে যাব। লেখাপড়া না শিখলে খাবি কি রে হারামজাদা? ভেবেছিস বুঝি বাপ খুব বড়লোক? তোর উড়োবার জন্যে টাকা রেখে যাবে?

আবার এক চড় মেরে বললেন, বোস। পড়তে বোস হতভাগা।

কাঁচু মাচু করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়তে বসল ছেলে।

আর সেই ছেলেকে প্রহার করে বাপের সেই রাগটা গিয়ে পড়ল মাষ্টারের ওপর।

বললেন, আপনিই-বা কিরকম মাষ্টার শুনি?

বিমলের মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

গম্ভীরমুখে বলল, এমনিই।

খুব জোরে জোরে বাপ চীৎকার করে উঠলেন, কি বললেন?

বিমল মুখ তুলে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। বলল, এবার আমাকে মারবেন নাকি?

ভদ্রলোকের নাম শিবরতনবাবু। তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। বসলেন বিমলের পাশে। বললেন, রাগের মাথায় বলে ফেলেছি কথাটা। কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা, আপনি তো জ্ঞানীগুণী মানুষ, বলতে পারেন—

বলেই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে, যা বাবা একটু ভেতরে যা। মাষ্টারের সঙ্গে আমার ছুটো প্রাইভেট কথা আছে, সেরে নিই।

ছেলেটা চলে গেল।

শিবরতনবাবু বললেন, আমার ওই একটিমাত্র ছেলে, জানেন তো?

বিমল বলল, জানি।

সেই ছেলে যদি ওইরকম হয়, বাপের মনে সুখ থাকে, না শান্তি থাকে? কই আপনিই বলুন দেখি!

বিমল চুপ করে রইল।

শিবরতনবাবু বললেন, দেখুন, আমার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই বাড়ীটা আছে, আর কোটপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াই বলে ছেলেটা ভেবেছে বুঝি বাপের মেলা টাকা, মরে গেলে সব আমারই হাতে আসবে, কাজেই আমার আর লেখাপড়া শিখে দরকার নেই, ফুর্তি করে বেড়ালেই চলবে। কিন্তু শুনুন, এই ছেলেটার ওপরে আমার ছ-ছটা মেয়ে। সেই ছটা মেয়েকে পার করতে গিয়ে আমার জিব বেরিয়ে গেছে। এই বাড়ী মর্টগেজ দিয়েছি তিনবার। কাজেই এই বাড়ীর আশা খতম। আমি চোখ বুজলেই ছেলেটাকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই ভেবেছিলাম ছেলেটাকে যদি লেখাপড়া শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারি, ব্যাটা রোজগার করে খেতে পারবে। আর সেই জন্যেই আপনাকে প্রাইভেট মাষ্টার রাখলাম মাসে মাসে চল্লিশটি করে টাকা দিয়ে। এই টাকা রোজগার করতে, সত্যি কথা বলছি মশাই, আমি জোচ্চুরি বাটপাড়ি অনেক কিছু করি। কিন্তু ছেলেটা কেন এমন হলো বলুন তো?

বিমল বলল, সেকথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।

আরে মশাই, আমি যদি ভাল জানবো তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবো কেন?

বিমল বলল, আপনার ছেলের মধ্যে আপনি নিজেকে দেখতে পান না ?

শিবরতনবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, কিরকম ? কি রকম ?

উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলে আপনার বিষয়-সম্পত্তিই শুধু পাবে তা তো নয়, আপনার স্বভাব আপনার চরিত্র—এ-সবেরই উত্তরাধিকারী সে। ঠিক আপনারই মত হবে আপনাব ছেলে।

শিবরতনবাবু বললেন, কিন্তু আমি তো বি-এ পাশ করেছি, ছেলে তো একটা পাশও করতে পারল না !

বিমল বললে, না পারুক, আপনার অন্য গুণগুলো সে পাবে।

যেমন ?

যেমন—এই যে আপনি বললেন টাকা রোজগার করতে গিয়ে কিছুই আপনার আটকায় না—জাল জোচ্চুরি বাটপাড়ি ; সেইগুলো আপনার ছেলে বেশ ভাল পারবে। আপনার চেয়েও বড় জালিয়াৎ হবে, আপনার চেয়েও বড় জোচ্চোর হবে, আপনার চেয়েও—

এবার যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন শিবরতনবাবু। বললেন, থামুন। আপনাকে বলাই আমাব অন্যায় হয়েছে। আমার কথার আসল মানেটাই আপনি বুঝলেন না। থাক এখন ওসব বাজে কথা রাখুন। আপনি বলুন, ও-ছেলের লেখাপড়া কিছু হবে কিনা।

বিমল বলল, হবে বলে তো মনে হয় না।

তাহলে আর আপনাকে রাখা কিসেব জন্যে ?

ইচ্ছে না হলে রাখবেন না।

শিবরতনবাবু বললেন, ভাল কথা। আপনাকে কি একমাসের মাইনে বেশি দিতে হবে নাকি ?

বিমল বলল, দিতে যদি আপনার কষ্ট হয় তো দেবেন না।

শিবরতনবাবু বললেন, কষ্ট হবে। কাজেই ও ছেলেকে আর মিছেমিছি প্রাইভেট পড়ানো। এই নিন।

পকেট থেকে চল্লিশটি টাকা বের করে বিমলের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, কাল থেকে আপনাকে আর আসতে হবে না।

একটি নমস্কার করে বিমল চলে যাচ্ছিল, শিবরতনবাবু বললেন, একটি কাগজে লিখে দিয়ে যান মশাই—আপনার আর দাবী-দাওয়া কিছু রইল না, চাকরি আপনি ছেড়ে দিলেন। কাজ কি মশাই, দিনকাল ভাল নয়, ফট করে একটা নালিশ করে দিলেই বাস, সঙ্গে সঙ্গে ডিক্রি।

বিমল হাসতে হাসতে সব কিছু লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

বিমল ভাবল, টাকাটা না পেলে আজ হয়ত সে তার বাবার জন্য গীতা একখানি কিনে নিয়ে যেতে পারতো না। কাজেই ভালই হলো।

বইএর দোকানে ঢুকে বিমল প্রথমেই একখানি গীতা কিনল। গীতাখানি হাতে নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরে আসছিল, হঠাৎ তার কি যেন মনে হতেই আর একটা দোকানে ঢুকে এক দিস্তা সাদা কাগজ কিনলো।

কাগজ সে কেন কিনলো আমরা বুঝতে পারলাম তখন—সেদিন বাড়ী ফিরেই বিমল যখন সেই কাগজের ওপর একাগ্রমনে কি যেন সব লিখতে বসল।

গায়ত্রী ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, কি লিখছিস?

লিখতে লিখতে বিমল বলল, এখন নয়, লেখা শেষ হোক, তারপর বলবো। গীতাখানা বাবাকে দিগে যা।

গায়ত্রী আরও দু'-একবার ঘরে ঢুকল. কিন্তু যতবারই ঢোকে ততবারই দেখে বিমল মাথা হেঁট করে একমনে লিখে চলেছে।

রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, খেয়ে নিলে ভাল হয় না বিমল?

বিমলের যেন চমক ভাঙল। সত্যিই তো, দিদি তার খাবার নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকবে ?

লেখা বন্ধ করে বিমল খেতে গেল।

খাবাব ধরে দিয়ে গায়ত্রী রোজই তার সুমুখ থেকে পালিয়ে যায়। নিতান্ত দরিদ্রের সংসার, একটা জোয়ান ছেলেব যা খাওয়া উচিত সেরকম খাবার সে কোনোদিনই তাকে দিতে পারে না, তাই লজ্জায় গায়ত্রী সেখান থেকে সরে পড়ে। বলে, আব কিছু দরকার হলে চেয়ে নিস।

বলতে হয় তাই বলে। বিমলও কোনদিন কিছু চায় না। চাইবে কি ? সবই তো সে বিমলের সামনে ধরে দিয়ে চলে যায়।

সেদিনও তেমনি চলে গিয়েছিল গায়ত্রী। ফিবে যখন এলো বিমলের খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে।

গায়ত্রী মুখ টিপে টিপে হাসছে।

বিমল সেটা দেখতে পেলো। বলল, হাসছিস যে !

গায়ত্রী বলল, বেশ হয়েছে। খাসা হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই অত দুঃখু ভাল লাগে না। একটু হাসিয়ে হাসিয়ে লেখ্ না মানুষ হাসতে পায় না। লেখা পড়ে একটু হাসুক না।

বিমল বলল, ওরে দুষ্টু মেয়ে। তুই বুঝি চুবি করে আমার লেখাটা পড়ছিলি এতক্ষণ ?

গায়ত্রী বলল, হ্যাঁ, পড়তেই তো গিয়েছিলাম।

বিমল বলল, বেশ করেছিলি।

বলে হাত-টাত ধুয়ে এসে বলল, কি বলছিলি দিদি ? খুব দুঃখের লেখা হচ্ছে ?

গায়ত্রী বোধকরি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, না না কিছু বলিনি। তুই লিখে যা।

বিমল বলল, কিন্তু দিদি, জীবন যার দুঃখময়, সুখের কথা আনন্দের কথা সে লিখবে কেমন করে ?

গায়ত্রী বলল, অমরেশ এসেছিল।

—কিছু বলছিল?

গায়ত্রী বলল, কাল বলব। যা তুই শুগে যা।

নিজের ঘরে এসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিমল লিখল।

তারপর লেখা বন্ধ করে ফিরে সেগুলো পড়বার চেষ্টা করল।

নিতান্ত অক্ষম রচনা। নিজেরই হাসি পেতে লাগলো। লেখা অত সহজ নয়। তা যদি হতো তাহলে অনেকেই লিখতো। মনের ভাব সবাই প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু সে প্রকাশ সকলের গ্রহণযোগ্য হয় না।

চাকরির খোঁজে একজন প্রকাশকের বইএর দোকানে গিয়ে একজন সাহিত্যিককে দেখে বিমলের মনে লেখবার সাধ জেগেছিল। সাধ জেগেছিল বোধহয় লিখে কিছু উপার্জন করবার আশায়। কথাটা ভেবে নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো বিমলের। তক্ষুনি যা কিছু লিখেছিল সেগুলো ছিঁড়ল খণ্ড খণ্ড করে, তারপর দিয়াশালাই জ্বেলে কাগজের টুকরোগুলি পুড়িয়ে ফেলল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। দিনের বেলা পথে পথে ঘুরে ঘুরে যখন সে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে—ভাবে, রাত্রিটা এলে হয়, বিছানায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে বাঁচবে, কিন্তু রাত্রি আসে, অথচ ঘুম আসে না। প্রতি রাত্রেই অনেকক্ষণ ধরে এমনি একান্ত নির্জনে তাকে শয্যায় পড়ে ছটফট করতে হয়। অসংযত চিন্তার রাশি নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে তার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়,—কি যে হয়, সে নিজে কিছুই বুঝতে পারে না।

আজ ভেবেছিল, সব-কিছু ভুলে থাকবার মত তবু যাহোক একটা কাজ পেয়েছে। যতক্ষণ না ঘুম পাবে ততক্ষণ বসে বসে লিখবে। লিখবে মানে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলবে। তারপর ঘুমে যখন চোখ ভেরে আসবে তখন শুয়ে পড়বে। কিন্তু [illegible] তো

হলো না। বেয়াড়া মন, বিমলের কথা শুনলো না। যে-কাজ তার নিজের নয় সে-অনধিকারচর্চা সে করতে চাইল না।

ছেলে পড়ানোর একটা কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন একটি মাত্র ভরসা।

মনে হলো—এই রাজ্যটা যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা বড় স্বার্থপর, বড়ই অযোগ্য। রাজত্বে দুঃখ দারিদ্র্য অন্নাভাব থাকবে কেন? যারা যোগ্য যারা সমর্থ, যারা কাজ চায় তাবা কাজ পাবে না কেন?

আবার তখনই মনে হয় সে নিজেই বোধকরি অযোগ্য। নইলে দেশের এত এত লোক কাজকর্ম করে দিব্য নিশ্চিন্তে জীবিকা নির্বাহ করছে আর সে নিজে কিছু করতে পারছে না কেন।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে এক-একদিন তার চোখ ফেটে জল বের হবার উপক্রম হয়, মনে হয়, বালিশে মুখ গুঁজে খানিকটা কাঁদে। কিন্তু তাও যখন পারে না, তখন হয়ত-বা কখনও বিছানা থেকে উঠে সেই ছোট ঘরটির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, ভাঙা চৌকিটার ওপর চুপ করে বসে থাকে, কিম্বা হয়ত জানলাটা খুলে দিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সুমুখে আগাছার জঙ্গলের ওপর শীতের কনকনে বাতাস গায়ে এসে লাগে, অদূরে পড়ো-বাড়ীর ভাঙা সিঁড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার পাশে একটা ভাড়াটে গাড়ীর আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়াগুলো মাটিতে পা ঠুকতে থাকে।

কোথায় যেন সে পড়েছিল—মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মানুষ ইচ্ছা করলে সব-কিছু করতে পারে।

কিন্তু তার নিজের বেলা সবই যেন ব্যর্থ হয়ে গেল।

এক একসময় মনে হয় বুঝি নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের আত্মসম্মান-বোধ বিসর্জন দিতে পারলে হয়ত-বা তার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

কি ভাল আর কি মন্দ কিছুই বুঝতে না পেরে এক একদিন

সে ওই নৈশ নিস্তব্ধ আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সর্ব শক্তিমান ভগবানের কথা মনে হয়। অদৃশ্য সেই বিরাট শক্তির কাছে প্রার্থনা জানায়।

সেদিন তার হঠাৎ মনে হলো যেন—মানুষের নিঃসঙ্গ অবস্থাটাই মারাত্মক। সেই জন্যই বোধকরি নির্জন কারাবাস জেলের কয়েদী-দের সব-চেয়ে বড় শাস্তি। মানুষের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে, মানুষের কাছে কাছে যতক্ষণ সে ঘুরে বেড়ায়—সুখে হোক, দুঃখে হোক, সময়টা তার মন্দ কাটে না। কিন্তু এই রাত্রির নির্জনতায় যখন একাকী সে তার এই ঘরের মধ্যে চুপ করে শুয়ে থাকে, তখন মনে হয় তার মনের কথা বুঝবার মত কোনও মানুষ এ পৃথিবীতে নেই। কেউ যেন তাকে বুঝছে না, কেউ যেন তাকে বুঝতে চায় না। সবাই ভাবে বুঝি সে দাম্ভিক। সে যেন অতিরিক্ত রকমে আত্মকেন্দ্রিক।

কিন্তু সে কথা যে সত্য নয় মানুষকে তা সে বুঝাবে কেমন করে?

দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিখানার দিকে সেদিন হঠাৎ তার নজর পড়ে গেল। শীত যেন একটু বেশি বলে সুমুখের জানলাটা বন্ধই ছিল, ঘরের অন্ধকারে ছবিটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল না,—উপরের কাঁচখানা মাত্র চিক চিক করছে।

এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমনি আর-একটা ছবি টাঙ্গানোর কথা তার মনে পড়ল। বেশিদিনের কথা নয়। অমরেশের বাড়ীতে সেদিন উৎসবের আয়োজন। বিভার পুতুলের বিয়ে। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে সে পেরেক ঠুকছিল,—নিভা তার হাতে পেরেক তুলে দিলে। হাতে হাতে ঠেকবামাত্র সে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিল। মনে হয়েছিল তার কানের দুল, মাথার চুল, চোখের তারা—সব যেন জ্বলছে।—আগুনের একটি শিখার মত দীপ্তিমতী নারীর সেই

অপরূপ রূপলাবণ্য জীবনে সে-দিন সর্বপ্রথম তার নজরে পড়ল। আপাদমস্তক তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। কেমন যেন একটা অননুভূতপূর্ব অনুভূতি সে অনুভব করেছিল মনের মধ্যে।

যৌবনের একটা স্বাভাবিক উত্তেজনা ছাড়া সেটা যে আর কিছুই নয়—তা সে বুঝতে পেরেছিল।

এবং বুঝতে পেরেই পালিয়ে এসেছিল সেখান থেকে। তার পর থেকেই সেখানে যাওয়া সে বন্ধ করেছে। এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে সে রাজী নয়।

নিভা তার বন্ধুর বোন—মস্ত বড়লোকের মেয়ে, আর সে নিজে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক নিতান্ত দরিদ্র যুবক।

এ দুরাশাকে মনের মধ্যে লালন করে সে অপরাধী হতে চায় না। কিন্তু সেইদিনই প্রথম যেন তার মনে হয়েছিল—মানুষের চোখেরও যেন একটা নীরব ভাষা আছে। নিভার চোখের অনুচ্চারিত একটি ভাষা যেন তার মনকে স্পর্শ করেছিল সেদিন।

তার পরেও বারম্বার সেকথা তার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এ তার মনের ভ্রম। নিজের মনকে সে এই দুর্বলতার জন্য তিরস্কার করেছে।

তবু কি জানি কেন, তার এই সমস্যাজর্জরিত মনের সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তাকে অবহেলায় অতিক্রম করে তার জীবনের সেই পরম মুহূর্তটি এক্‌একবার তাকে কোন্ এক স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নে মশগুল করে রাখে।

দুঃখ দুর্ভাগ্য যার নিত্য সহচর, এমনি একটি সুখস্বপ্নের আকাশ-কুসুম মনে হয় যেন তার পরম সম্পদ। মনের ভ্রমই হোক আর যাই হোক, অস্তিত্বহীন অবয়বহীন সেই অলীক স্বপ্নসম্পদকে মন যেন কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

তাকে নিয়েই কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে আনন্দ পায়

দুর্বল মনের এই এক অদ্ভুত খেলা।

দশ

বিমলের ঘুম যখন ভাঙল, প্রভাতের রৌদ্র তখন জানলার পথে ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। এত বেলায় ঘুম তার কোনোদিন ভাঙে না, আজ কেন যে এত দেরি হয়ে গেল, বিমল কিছুই বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে বাইরে আসতেই দেখল, রত্নেশ্বর আপনমনে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করছেন। গায়ত্রী কল-তলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

বিমল কাছে এসে দাঁড়াতেই গায়ত্রী বলল, এত দেরি যে? সারারাত জেগে গল্পটা লিখেছিস বুঝি?

বিমল বলল, না দিদি, সেটা আমি কাল পুড়িয়ে ফেলেছি।

—যাঃ, মিছে কথা।

গায়ত্রী বিশ্বাস করল না।

বিমল বলল, সত্যি বলছি দিদি। কাল লিখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম—লেখা বড় শক্ত কাজ। সবার দ্বারা হয় না।

গায়ত্রী বলল, আমার কিন্তু ভালোই লেগেছিল। লিখলে পারতিস।

বিমল এড়িয়ে গেল কথাটা। বলল, আমাকে কিন্তু এক্ষুনি বেরোতে হবে দিদি। কি কি বাজার করতে হবে বল্। বাজারটা করে দিয়েই অমনি বেরিয়ে যাব।

আগে চা খা, তার পর বাজার যাবি।

বিমলকে চা দিতে এসে গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি? এতো তাড়া কিসের?

বিমল বলল, বাজারটা এনে দিই আগে, তারপর বলব।

বাজার এনে দিয়ে কিছু না বলেই বিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল, গায়ত্রী বলল, যেখানে যাচ্ছিস সেখান থেকে ফিরতে দেরি করিস না।

কেন বল তো?

তোকে আজ একবার অমরেশের বাড়ী যেতে হবে।

বিমল হেসে বলল, আমি সেইখানেই যাচ্ছি।

গায়ত্রী বলল, নিভাকে একবার আসতে বলবি। বলবি—দিদি তোমাকে ডেকেছে।

বিমল থমকে থামলো। জিজ্ঞেস করল—নিভার সঙ্গে তোর কি দরকার?

তাও বলতে হবে তোকে?

বিমল আর দাঁড়ালো না। বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কেন যাচ্ছে সেখানে?

কাল রাত্রে যে সুখস্বপ্নে সে বিভোর হয়ে ছিল তার সেই স্বপ্ন-সহচরীকে একটিবার দেখতে? সেই দুর্লভ মুহূর্তটিকে আর-একবার ফিরে পাবার জন্য অবচেতন মন কি তার এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে?

মনকে সে আর-একবার শাসন করল। ভাবলো যাবে না। পথের ওপর একবার বিমল থমকে থামলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন অন্যমনস্কের মত এগিয়ে গেল অমরেশের বাড়ীর দিকে।

পথ চলতে চলতে আবার সেই চিন্তা—

মানুষ গরীব হয় কেন? তার স্বভাব, তার বুদ্ধির দোষে, না তার অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়? কিন্তু এ মীমাংসা সে কিছুতেই করে উঠতে পারে না। পথের পাশে চায়ের দোকানে ভিড় তখনও কমে নি। যে ফুটপাথের ওপর দিয়ে বিমল হাঁটছিল, দেখল, সুমুখে একটা চায়ের দোকানের খোলা দরজার পাশে একজন খোঁড়া ভিক্ষুক তার হাতের ভিক্ষাপাত্রটি তুলে ধরল। বিড়ি টানতে টানতে দুজন বাবু দোকান থেকে বের হচ্ছিল, ভিক্ষুককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তারা হাসতে হাসতে ওপাশের ফুটপাথে গিয়ে পৌঁছল। সম্ভবতঃ তারা কোনও আপিসের বাবু। বিমল ভাবছিল তাদেরও ত

সংসার আছে, দারিদ্র্য আছে. দুঃখ দুর্ভোগ হয়ত তাদেরও নিত্যসহচর, কিন্তু সে কেন তাদের মত অমন করে হাসতে পারে না। হয়ত তার নিজের দারিদ্র্যই সকলের চেয়ে উৎকট, তার অভাব সবার চেয়ে বেশি।—আর ঐ খোঁড়া ভিখারী? লাঠি ধরে সে তখন তারই দিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ যদি সে তার ভিক্ষাপাত্রটি তারই সুমুখে তুলে ধরে, তার ওই ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ এবং খোঁড়া পা দেখিয়ে কিছু ভিক্ষার প্রত্যাশায় তার দুঃখের কাহিনী তাকে শোনাতে আরম্ভ করে—তা হলে একটি পয়সাও তো সে তাকে দিতে পারবে না! এই লজ্জায় বিমল তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একটি মোটর তার পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল। চোখটা তার গাড়ীর দিকে পড়তেই দেখল, মোটরের ভেতর বসে আছে অমরেশ, আর তার ডানপারে কে একজন ভদ্রলোক, ভাল চেনা গেল না। দেখতে দেখতে গাড়িখানা অনেক দূরে চলে গেল।

অমরেশের বাড়ীর কাছাকাছি এসে বিমল ভাবলো, অমরেশ যখন বাড়ীতে নেই তখন আর তার সেখানে গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু যাবে কি যাবে না এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে অমরেশের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলো। বাড়ী না ঢুকে কাল সে এইখান থেকেই ফিরেছিল, আজ কিন্তু তার আর ফেরবার পথ রইল না। রাস্তার ওপর একটা লোক পুঁতির মালা বিক্রি করছিল। তাকে ডেকে দেবার জন্য বিভা তখন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কৈলাসের হাত ধরে টানাটানি করছে। হঠাৎ বিমলের ওপর তার নজর পড়তেই কৈলাসের হাতটা সে ছেড়ে দিয়ে বিমলদা বলে ছুটে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, দাওনা বিমলদা আমার রাণীর একছড়া নেকলেস কিনে। বিয়ের সময় থেকে মেয়েটাকে কিছু দেওয়া হয় নি।—বলেই সে নিজেই ডাকতে আরম্ভ করল, এই মালা, এই পুঁতির মালা-ওলা!

ফিরিওলা তখন কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, বিভার ডাক শুনে ফিরে এল।

বিমল যে কি বলে তাকে নিরস্ত করবে কিছুই বুঝতে পারল না, তাড়াতাড়ি বিভার হাতখানা চেপে ধরে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে এনে বলল, পয়সা যে আমার কাছে এখন নেই দিদি, এর পর আমি ভাল নেকলেস তোমার মেয়ের জন্যে এনে দেব।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠতেই আর-কিছু সে বলতে পারল না। চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বিভার হাতখানা আরও একটুখানি জোরে চেপে ধরে বলে উঠল, কেমন ?

পয়সা তোমায় দিতে হবে না—এই তো আমাব কাছে টাকা রয়েছে।

বিভা তার বাঁ হাত দিয়ে জামার পকেট থেকে একটি টাকা বের করে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বিমলকে দেখিয়ে দিল।

ফিরিওলা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভাল দেখে আট আনার মালা কিনে বিভা বলল, থাক আর চাইনে বিমলদা। এতে আমার সব মেয়েগুলোর গয়না হবে।

চল তবে।—বলে বিমল তার হাত ধরল।

অমরেশের বাড়ীর নীচের তলায় রাস্তার ধারে যে কয়েকখানা ঘর ছিল, প্রয়োজন হতো না বলে সেগুলো প্রায় অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকত, আজ সেগুলো খোলা হয়েছে দেখে বিমল একবার সেই দিকে তাকিয়ে দরজা পার হয়ে এসে চুপ করে দাঁড়াল। ঘরগুলো শুধু খোলা নয়, বাড়ীর সঙ্গে তাদের সমস্ত সংস্রব একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে রাস্তার দিকে দেয়ালের গায়ে কাঁচ দিয়ে শো-কেশ্ তৈরি হয়েছে. ঘরের ভেতরেও কাঠের তাক, কাঁচের আলমারি, মার্বেল-টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি ইত্যাদি বিস্তর মূল্যবান আস্‌বাব-পত্রের অন্ত নাই। ওষুধের শিশি, বোতল এবং অন্যান্য

সাজসরঞ্জাম দেখে নতুন একটা ডাক্তারখানা খোলা হবে বলেই মনে হলো।

বিমল জিজ্ঞেস করল, এ-সব আবার কবে হলো রে বিভা?

বিভা কোনও জবাব দিল না। সে তখন তার পুঁতির মালা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অমবেশ বাড়ীতে ছিল না। মালাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বিভা অন্য ঘরে চলে যাচ্ছিল। বিমল বলল, তোমার দিদিকে একবার ডাক ত' বিভা—

বিভা বলল, আমি ডাকতে পারব না। তুমি এসো না দিদির ঘরে।

না, আমি এইখানে দাঁড়াই। তুমি ডাকো নিভাকে।

বিমল যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তারই পেছনে ছিল একটা জানলা, আর সেই জানলার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল নিভা। বিমল দেখতে পায়নি।

বিভা বলল, আমাব কত কাজ দেখতে পাচ্ছ না বিমলদা। মেয়েটার গয়না তৈরি করতে হবে এক্ষুনি।

এই বলে বিভা সত্যিই চলে গেল।

হঠাৎ ভারি মিষ্টি একটি হাসির শব্দে বিমল পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে—তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিভা। মাঝখানে মাত্র কয়েকটা লোহার রড।

নিভার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। বলল, পাশের দরজা দিয়ে এই ঘরে আসুন।

বিমল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। নিভা সরে গেল জানলা থেকে।

দোরের বাইরে পায়ের জুতো খুলে বিমল ঘরে ঢুকলো।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো নিভা। পরণে নিতান্ত সাধাসিধে একখানি রঙিন শাড়ী, দুহাতে দু'গাছা মাত্র সোনার চুড়ি, কানে দুটি হীরের টাপ্। অপূর্ব সুন্দরী মনে হচ্ছে তাকে।

নিভা বলল, জুতো খুলে ঘরে ঢুকলেন যে? আবার যদি ফেলে দিই।

বিমল একটুখানি হাসলো শুধু।

নিভা বলল, বিভাকে কী বলছিলেন আপনি? আমি এইখানে দাঁড়ালাম, নিভাকে ডেকে দাও—

বিমল বলল, আমার একটু কাজ আছে। তোমাকে একটা কথা বলেই চলে যাব।

—কি কথা?

বিমল বলল, দিদি তোমাকে একবার ডেকেছে।

তা এই কথাটা বলতে এত কাঁচুমাচু করছেন কেন?

জবাবের জন্য বিমলের মুখের দিকে নিভা তাকিয়ে রইলো। বিমল কিন্তু তার কোনও জবাব দিল না।

বলুন!

কি বলবো?

দিদি আমাকে যেতে বলেছে এই কথাটা বলতে এত সঙ্কোচ কেন আপনার?

বিমল বলল, সেকথা তুমি বুঝবে না।

নিভা বলল, আমাকে আপনি বোধহয় মানুষ বলেই মনে করেন না।

না না তা কেন! তা নয়। আমাদের বাড়ী—

কী আপনাদের বাড়ী?

বিমল বলল, তোমার যাবার যোগ্য নয়।

ম্লান একটু হাসল নিভা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার। বিমলের এত কাছে সে বসেছিল যে তার শব্দটা বিমল শুনতে পেলো।

সোজা তার মুখের দিকে তাকাল বিমল। সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই অপরূপ লাবণ্য।

বিমল বলল, তাহ'লে আমি যাই ?

বলেই সে উঠতে যাচ্ছিল।

নিভা খপ্ করে তার হাতটা ধরে বসলো!

না, বসুন। বলেই নিভা তেমনি তার হাতখানা ধরেই বলতে লাগলো, আপনি কি শুধু এই কথাটা বলবার জন্যেই এসেছিলেন ?

বিমল বলল, হ্যাঁ।

নিভা তার হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, যান।

বিমল তখনও পা বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি, নিভা বলল, সেই সেদিন থেকে আপনার কি যেন হয়েছে।

মুখ ফিরিয়ে বিমল জিজ্ঞেস করল, কোন্ দিন থেকে ?

সেই যে বিভার পুতুলের বিয়ের দিন, আপনি যেদিন ছবি টাঙ্গাচ্ছিলেন আর আমি আপনার হাতে পেরেক তুলে দিচ্ছিলাম—

নিভার দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল বিমল। সে বহ্নিশিখার দিকে তার যেন আর তাকাবার সাহস হলো না।

সিঁড়ির ওপর বিমলের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

নিভা কিন্তু ঠিক যেমনটি দাঁড়িয়েছিল তখনও সেখানে ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

এগারো

হ্যাঁরে বিমল, গিয়েছিলি নিভার কাছে ?

বিমল খেয়ে উঠতেই জিজ্ঞেস করলো গায়ত্রী।

বিমল বলল, গিয়েছিলাম।

কি বললে ?

কিছু বলল না। শুধু তোর নিমন্ত্রণটা সে শুনল আমার মুখ থেকে।

আসবে কিনা বলল না ?

না।

ধন্যি মেয়ে বাবা! খুব দেমাগ—না রে ?

কি জানি দিদি, আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

গায়ত্রী একটু হাসলো। বলল, বুঝতে ঠিকই পারিস, বলছিস না আমার কাছে।

বিমল চুপ করে রইল।

আজই যদি আসে, কি খেতে দেবো বল দেখি ?

বিমল বলল, তোমার অতিথি, তুমিই জানো। যদি চাও তো বল—দোকান থেকে কিছু খাবার এনে দিচ্ছি।

গায়ত্রী বলল, না। দোকান থেকে কিছু আনতে হবে না। আমি ওকে মুড়ি খাওয়াব।

সেই আনন্দেই থাকো। মুড়ি সে খাবে না। আচ্ছা দিদি তুমি ওকে ডেকেছ কি জন্যে ?

মেয়েটি কেমন তাই জানবার জন্যে। সেদিন এসেছিল, বাবার অসুখের জন্যে ভাল করে কথা বলতে পারিনি।

বিমল বলল, যাকগে মরুকগে, আসে আসবে, না আসে না আসবে। আমার কাজ আছে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ তা যাবি বই কি। আজকেই তো তোর কাজ থাকবে!

এই বলে গায়ত্রী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বিমলের মনে হলো—এ কি? দিদি হাসছে কেন? তবে কি দিদি টের পেয়েছে তার দুর্বলতার কথা? না, তাই-বা কেমন করে হয়?

কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে বিমল বলল, আচ্ছা দিদি, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হলো। শোন্!

বলেই তার মনে হলো—দিদির এখনও খাওয়া হয়নি। বলল, খেয়েদেয়ে আসবি আমার ঘরে। তখন বলব।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেঁসেলের পাট চুকিয়ে দিয়ে গায়ত্রী বিমলের ঘরে গিয়ে দেখে, বাইরে বেরোবার জন্যে সে তৈরি হয়ে বসে আছে।

আজ নাই-বা বেরুলি বিমল, নিভা আসবে, অমরেশ আসবে আর তুই বাড়ীতে থাকবি না?

কেমন করে থাকি বল! সত্যি কথাটা বলি তাহলে শোন্। দুটি টিউশনি ছিল, তার মধ্যে একটি গেছে। একটা-কিছু জোগাড় করতে হবে তো!

গায়ত্রী বলল, হচ্ছে না তো কিছু! ঘুরেই তো মরছিস!

কেন হচ্ছে না বলতে পারিস দিদি? আমার তো চেষ্টার ত্রুটি নেই।

গায়ত্রী বলল, অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট তুই বিশ্বাস করিস?

গায়ত্রী বলল, নিশ্চয় করি। তুই করিস না?

না দিদি, অদৃষ্ট আর পুরুষকার, অদৃষ্ট আর পুরুষকার—অনেক-দিন থেকে শুনে আসছি। কলেজে যখন পড়তাম তখন মনে হতো—ও-সব বাজে কথা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ আমাদের এই

ভারতবর্ষ, মানুষগুলো সহজে কাজ করতে চায় না—একটু কাজ করলেই ঘেমে যায়, হাঁপিয়ে ওঠে, তাই প্রকৃতিটা আমাদের স্বভাবতই একটু অলস। সেই অলসতার সান্ত্বনা হচ্ছে এই অদৃষ্ট। অনেক তো করলাম, কিন্তু অদৃষ্টে নেই তো আর কি হবে? এমনি একটা কথা সবাই বলে থাকে। আমি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারতাম না সেকথা। ভাবতাম, মানুষ চেষ্টা করলে সবই করতে পারে। সেই ধারণা সেই বিশ্বাস আমার এখনও পর্যন্ত ছিল। ভাবতাম মানুষের চরিত্রই মানুষের অদৃষ্ট।

গায়ত্রী বলল, সে আবার কি রকম?

বিমল হেসে উঠল।—বুঝতে পারলি না তো?

আমি মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ, কেমন করে বুঝবো বল্।

বিমল বলল, ছাখ, মাছি আর মৌমাছি এই দুটো অতি নিকৃষ্ট জীবের কথা ভেবে ছাখ। যেখানে আবর্জনা নোংরা সেই-খানেই মাছি গিয়ে বসে, আর মৌমাছি খুঁজে বেড়ায় সুন্দর ফুল—যে ফুলে মধু আছে। মাছিও তো মধু খায়, কিন্তু তার চরিত্র কিছুতেই তাকে ফুলের দিকে যেতে দেয় না। মৌমাছিকেও যেতে দেয় না নোংরা আবর্জনার দিকে। মানুষের বেলাও ঠিক তেমনি। যার যেরকম চরিত্র, সে সেই রকম কাজ করে, ফলও ঠিক সেই রকম পায়।

গায়ত্রী বলল, কি জানি ভাই, তোরা লেখাপড়া জানিস, অনেক বাঁকা কথাকে সোজা করতে পারিস, সোজা কথাকে বাঁকা করতে পারিস। আমরা তা পারি না। আমরা যে বিশ্বাস নিয়ে জন্মেছি সেইটেই দিনে দিনে পাকা হয়ে বসে গেছে মনের ভেতর। কিছুতেই তা থেকে মুক্তি পাই না। তবে এই যে অদৃষ্টের কথা বলছিস, একে বিশ্বাস না করে যে পারি না কিছুতেই। তুই নিজের কথাটাই একবার ভেবে ছাখ না। তোর চরিত্রের মধ্যে ফাঁকি দেবার তো কোনও ফিকির নেই, আলসে নোস, কুঁড়ে নোস চেষ্টাও

তো করছিস দিবারাত্রি, কিন্তু কই, নিজের অবস্থা তো স্বচ্ছল করতে পারছিস না।

বিমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।—কি জানি দিদি, এক এক সময় তোর ওই অদৃষ্টকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।

গায়ত্রী বলল, ওই যে পোড়ো বাড়ীটা—ওই যে রে, যেটাতে আজকাল শেয়াল-কুকুরের আড্ডা হয়েছে, ওই বাড়ীর ঐশ্বর্যের দিন আমি দেখেছি। কোথাকার কোন্ এক লটারির টিকিটে লাখ-খানেক টাকা পেয়েছিল, দুই ছেলে কি যেন একটা কারবার করে মেলা টাকা রোজগার করতো, ছেলের বিয়ে দিলে, লক্ষ্মীঠাকরুণের মতন বৌ এলো ঘরে, তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম কে যেন কাঁদছে ওদের বাড়ীতে। কি হলো? ছোট ছেলে গাড়ী চাপা পড়েছিল রাস্তায়, হাসপাতালে মারা গেল। তার পর মারা গেল কর্তা নিজে। তার পর ছেলে হতে গিয়ে বৌ মারা গেল নার্সিং হোমে, পেটের ছেলেটা তো আগেই মরেছিল। একা রইলো শুধু বড় ছেলে। ভাবলুম বিয়ে-থা করে আবার সংসারী হবে। কিন্তু কোথায়? তুই তো জানিস সেকথা।

বিমল বলল, জানি তো. সেই খুনের মামলা। পাঞ্জাবী মেয়ে-টাকে নিয়ে কত কাণ্ড করল। তারপর সেই মেয়েটাকে খুন করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

গায়ত্রী বলল, তবেই ছাখ। একে অদৃষ্ট ছাড়া কি বলবি? বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মুচিরাম গুড়ের কাহিনী পড়েছিস তো?

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল বিমল। বলল, যাকগে ও-সব কথা। ছাখ দিদি, আমি কি ভাবছিলাম জানিস? কাল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একবার মনে হলো—এখানে এমনি কষ্ট করে থাকার চেয়ে আমাদের দেশে চলে গেলে কেমন হয়?

গায়ত্রী হেসে উঠল। বলল, দেশের অবস্থা তুই জানিস না বুঝি?

বিমল বলল, জানি -ই-কি। জমিজমাগুলো এণ্ডারসন কোম্পানীকে কয়লাকুঠির জন্যে দিয়ে বাবা চাকরি পেয়েছিলেন কোম্পানীর হেড-আপিসে।

না না নতুন কয়লাকুঠি নয়। আমাদের গাঁয়েব পাশে পুরনো যে কয়লাকুঠিটা ছিল সেইটে কিনেছিল এণ্ডাবসন কোম্পানী। তারপম সেইটে বড় করবাব জন্যে না কি জন্যে জানি না, আমাদেব জমিজমাগুলো—

বিমল বলল, জমি যাক্‌গে, বাড়ীটা তো আছে। বাধারমণকে পাঠশালা করবার জন্যে দেওয়া হয়েছিল এই তো?

হ্যাঁ। তাবপর কি হয়েছে জানিস না বুঝি? কেমন করেই বা জানবি। তুই তখন সবে কলেজে ঢুকেছিস। পড়াশোনা নিয়ে মেতেছিলি, গ্রামের কথা কোনোদিন মনেই পড়েনি কারও।

এই বলে গ্রামেব যে করুণ কাহিনী গায়ত্রী বলল বিমলকে, সেবকম ভয়াবহ কাণ্ড যে কোনোদিন ঘটতে পাবে বিমলেব ছিল তা কল্পনার অতীত

এণ্ডারসন কোম্পানীব কয়লার সে কুঠি আর নেই। কিছুদিন সেখানে কাজ কবেই এণ্ডারসন সাহেব যখন বুঝতে পারলে কলিয়ারীটা ভাল নয় তখন সেটা সে বিক্রি কবে দেয় একজন এই দেশী লোককে। সেই লোকটি পয়সার লোভে এমন করে কয়লা কাটতে লাগলো যে রুকনা গ্রামটা আমাদের ফোঁপ্‌রা হয়ে গেল। গ্রামের যেখানে-সেখানে ফাটল দেখা দিল। প্রাণের ভয়ে গ্রামের লোক সব পালিয়ে যেতে লাগলো। শেষে একদিন আগুন লেগে গেল কলিয়ারীতে। শেষ পর্যন্ত মানুষের লোভের পরিণাম যা হয় তাই হলো। সমস্ত রুকনা গ্রামটা একদিন মাটির নীচে চলে গেল। এখন সেখানে আর কেউ নেই, কিছু নেই। প্রকাণ্ড একটা খাদের নীচে থেকে আগুন আর ধোঁয়া উঠছে দিনরাত।

গ্রাম কোথায় পাবি? আমাদের সে গ্রামও নেই, সে বাড়ীও নেই।

বিমল উঠে দাঁড়াল। বলল, ভাল। আমি চললাম।

গায়ত্রী বলল, শোন। নিভারা যদি আসে তো নিশ্চয়ই আসবে বিকেলের দিকে. তুই যেন চারটে-নাগাদ ফিরে আসিস বিমল।

না দিদি, আমি আসতে পারব না।

কেন পারবি না?

আর একটা টুইশনির খবর পেয়েছি, সেখানে যেতে হবে।

আজ সেখানে নাই-বা গেলি?

কাজটা হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

এর ওপর আর কথা চলে না। গায়ত্রী চুপ করে রইলো।

বিমল বলল, আসবেই যে তার কোনও ঠিক নেই দিদি। নিভা বড়লোকের মেয়ে।

এই বলে বিমল একটু হেসে চলে গেল।

গায়ত্রী মনে মনে বলল, শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা! বলেই সদর দোরটা বন্ধ করে দিল।

নিভা কিন্তু ঠিক এসে হাজির হলো সেইদিনই বিকেলে। একাই এসেছে গাড়ীতে করে। না এসেছে বিভা, না এসেছে অমরেশ।

ভারি মিষ্টি হাসি হাসতে হাসতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো গায়ত্রীকে।—আমাকে আসতে বলেছিলে, তাই এলাম।

হাতে ওটা কি?

মস্ত বড় একটা কাগজের প্যাকেট নামিয়ে রেখেছিল নিভা। বলল, কিছু না। বাবার জন্যে সামান্য সন্দেশ।

এই তোমার সামান্য হলো?

গায়ত্রী প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রত্নেশ্বরকে প্রণাম করিয়ে আনলে

নিভাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ বাবার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে না। না-জানি রত্নেশ্বর বেফাঁস কিছু বলে বসবেন হয়ত।

এসো বিমলের ঘরে বসি। আমাদের কি আর বসবার জায়গা আছে রে ভাই!

কিছু বলতে হলো না নিভাকে। বসবার জন্যে অনুরোধ পর্যন্ত করতে হলো না। সে-ই বরং গায়ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালো বিমলের তক্তাপোষের ওপর।

বাবু কোথায়?

গায়ত্রী প্রথমে বুঝতে পারেনি—বাবু সে কাকে বলছে

বাবু! বাবু কে?

নিভা তার মুক্তোর মত দাঁতগুলি দেখিয়ে সুন্দর চোখ দুটি তুলে নীরবে হেসে শুধু গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিলে এ-বাড়ীর বাবুটি কে।

গায়ত্রী বলল, কখন আসবে সে তো কিছু বলে যায়নি। আজ সে হয়ত নাও আসতে পারে। এই বলে তো সে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে। কোনোদিনই তো থাকে না দিনের বেলা। টো টো করে ঘুরে বেড়ায় কাজের সন্ধানে।

কাজ বুঝি তার নেই?

কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারলো না নিভা। ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো। দেখল, ঘরের যেখানে-সেখানে মোটা মোটা ইংরেজি বাংলা বই-কাগজ ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে একখানা বই নিভা তুলে নিলো।

কালিদাসের কুমারসম্ভব।

সেখানা রেখে দিয়ে আবার আর-একখানা তুলল।

ইবসেনের নাটক।

গায়ত্রী বলল, বইগুলো ছাখো তুমি, আমি আসছি।

ঘর থেকে বেরিয়েই গায়ত্রী তার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাবা সন্দেশ খাবে?

সন্দেশ? কোথায় পেলি? বিমল এনেছে বুঝি?

না, বিমল আনেনি। অমরেশের বোন নিভা এনেছে।

বত্নেশ্বর বললেন, দাও।

গায়ত্রীর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে নিভা ভাবল বুঝি সে তার বাবাকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে গায়ত্রী ফিরে এলো বিমলের ঘরে। তার হাতে একবাটি মুড়ি। গায়ত্রী ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলে নিভা তার পরণের কাপড়টাকে গাছ-কোমর করে বেঁধে বিমলের ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাটের বিছানাটা গুটিয়ে রাখছে।

গায়ত্রী একেবারে অবাক হয়ে গেল।

নিভা যে ঠিক এরকম কাজ করতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। বললে, ও আর কতক্ষণের জন্যে সাজালে নিভা, কাল এসে দেখবে—আবার ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি হয়ে গেছে।

নিভা হেসে বলল, কাল সত্যিই আমি আসব দিদি, এসে দেখে যাব কিন্তু।

গায়ত্রী বলল, তার আগে নাও এই মুড়িগুলি খেয়ে নাও! আমাদের বাড়ীতে এলে মুড়ি খেতে হবে তোমাকে। তোমার আনা সন্দেশ তোমাকে আর দিতে পারলাম না।

নিভা বলল, ধূলোয় হাত ভর্তি! খাব কেমন করে?

– আমাদের বাড়ীতে হাত ধোবার জল নিশ্চয়ই আছে। এসো তুমি, রাখো ও-সব।

গায়ত্রী নিভাকে টেনে নিয়ে এলো ঘর থেকে। কলতলায় নিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চার জলে হাত পা ধুইয়ে আবার নিয়ে গেল বিমলের ঘরে। তারপর মুড়ির বাটিটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, খাও।

নিভা মনের আনন্দে হাসতে হাসতে মুড়ি খেতে লাগলো। খেতে খেতে বলল, তুমি খাবে না দিদি? আমি একাই খাব?

—না। আমি বিধবা। আমাকে খেতে নেই।

—কে বললে খেতে নেই? খেতেই হবে তোমাকে।

এই বলে সে জোর করে ধরে বসলো গায়ত্রীকে।

গায়ত্রী বলল, থাম্ থাম্ টানাটানি করছিস কেন, আরও মুড়ি আমি নিয়ে আসি, তবে তো খাবো।

নিভা বলল, না আনতে হবে না। এই মুড়ি আমরা দুজনে খাব একসঙ্গে।

নিভার অনুবোধ এড়াতে পারলো না গায়ত্রী। একই সঙ্গে এক বাটিতে খেতে হলো তাকে।

দু'জনে হাসতে হাসতে মুড়ি চিবোচ্ছে আর গল্প করছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলো বিমল।

বিমলের হাতে একটি মাটির ভাঁড়। মুখে পাৎলা কাগজ দিয়ে ঢাকা, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

গায়ত্রী বলে উঠলো, এই যে তখন বলে গেলি আসবি না?

ঘরে ঢুকেই বিমল এমন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে, না পারছিল কথা বলতে, না পারছিল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, হাতে তোর ওটা কিরে?

বিমল বলল, বাগবাজারের রসগোল্লা।

বুঝেছি। নিভা আসবে বলে বাগবাজার থেকে রসগোল্লা নিয়ে ঠিক সময়ে এসে হাজির হলি। কিন্তু কই, আমার কোনও কথা তো এরকম করে রাখিস্ না।

বিমল একবার তাকাল নিভার দিকে। নিভা পরমানন্দে মুড়ি খেতে খেতে বিমলকে দেখে বন্ধ করেছিল খাওয়া। বিমলের চোখে চোখ পড়তেই হাসিতে চোখদুটি তার যেন কথা কয়ে উঠলো।

চোখের যে এমন সুন্দর ভাষা আছে বিমল তা জানতো না। আজ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো।

বিমল বলল, আমার এ-ঘরটা এমন করে কে সাজালে?

গায়ত্রী বলল, আমি যদি বলি—নিভা সাজালে, বিশ্বাস করবি?

বিমল বলল না।

গায়ত্রী বলল, যদি বলি নিভা তোর বাড়ীতে এসে মুড়ি খাচ্ছে?

সেটা অবশ্য দেখতে পাচ্ছি।

গায়ত্রী বলল, যদি বলি—

বলেই নিভার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গায়ত্রী চুপি চুপি বলল, নিভা তোকে ভালবাসে!

নিভা বলল, যাঃ ও!

বলেই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বিমল শুনতে পেলে না দিদি কি বলল। কিন্তু বুঝতে পারলো খানিকটা আন্দাজে। ভালই লাগলো তার। হাতের ভাঁড়টা মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে বলল দিদি, ওকে এই ভাল মিষ্টি খাইয়ে দে।

এই বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে।

গায়ত্রী বলল, যাচ্ছিস কোথায়? বোস্ এইখানে। আমি আসছি।

বলেই সে বিমলের আনা রসগোল্লার ভাঁড়টা বাঁহাতে দিয়ে তুলে নিল।

বিমল বলল, আমি থাকলে নিভা খাবে না।

নিশ্চয় খাবে। তুই বোস্।

বিমলকে আর কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে গায়ত্রী বেরিয়ে গেল।

বিমলকে বাধ্য হয়ে বসতে হলো। টিনের একখানা চেয়ার

ছিল কেরোসিন-কাঠের টেবিলটার পাশে, তাইতেই বসলো সে নিভার মুখোমুখি। নিভার দিকে তাকিয়ে বলল, খাও।

নিভা একটু হেসে বলল, লজ্জা করছে।

লজ্জা করছে, না খেতে ইচ্ছে করছে না?

কেন?

মুড়ি তো খাও না। এটা গরীব মানুষের খাবার।

বড্ডো খোঁটা দিয়ে কথা বলেন আপনি।

যা সত্যি তাই বলছি।

কি সত্যি?

মুড়ি খেতে তুমি পারবে না।

তাই বুঝি আমার জন্যে আপনি রসগোল্লা এনেছেন?

হ্যাঁ।

নিভা বলল, আমি আর আসব না এখানে।

কেন?

নিভা কিছু বলবার আগেই গায়ত্রী ঢুকলো। দু'হাতে দুটো চায়ের পিরিচ। একটার ওপর চারটে রসগোল্লা, একটার ওপর চারটে সন্দেশ।

সন্দেশের ডিসটা নামালো বিমলের হাতের কাছে, আর রসগোল্লার ডিসটা ধরিয়ে দিলো নিভাকে।

বিমল বলল, এ আবার কিরকম হলো?

ঠিকই হলো। তুই যার জন্যে রসগোল্লা এনেছিস, সে তোর জন্যে সন্দেশ এনেছে। তোরা খা দু'জনে আমার চোখের সামনে, আমি দেখি।

বিমল বলল, নিভা আর এখানে আসবে না বলছে দিদি।

কেন?

বিমল বলল, তুমি ওকে মুড়ি খেতে বাধ্য করেছ বলে।

নিভা বলল, ছাখো ছাখো কেমন মিছে কথা বলছে। এই কথা বলেছি আমি?

বিমল বলল, হাতমুখ ধুয়ে আসি।

এই বলে হাত মুখ ধোবার ছুতো করে সে বেরিয়ে গেল।

নিভা বলল, তুমি এই কথা বিশ্বাস করলে দিদি?

গায়ত্রী বলল, না। তোদের কারও কথাই বিশ্বাস করি না আমি।

নিভা বলল, কেন?

মনের কথা মুখ ফুটে তো বলবি না কেউ! সেই একটা গান আছে জানিস?

যাবি উ-ত্তরে যাবি বলবি আমি যাই দখিণে।
মুখের মিছে কথা দিয়ে মনের কথা নিবি চিনে॥'

হাত গুটিয়ে বসে থাকিস নে, খা।

নিভা বলল, তোমার ভাইকে খেতে বল আগে।

গায়ত্রী বলল, খেতে বলবো না তোকে খাইয়ে দিতে বলবো?

তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ দিদি।

তা একটু করছি। তোর কি খুব খারাপ লাগছে? বল, তাহলে আর কিছু বলব না।

নিভা মাথা হেঁট করে মুড়ির বাটি থেকে অবশিষ্ট মুড়িগুলি খেতে লাগলো। মুখে কোনও কথাই বলল না।

গায়ত্রী বলল, মনের আবেগে একদিনেই 'তুই' বলে ফেললাম, কিছু মনে করলি না তো?

এতক্ষণে নিভা কথা বললে। —আমাকে 'তুই' যদি না বল তো রাগ করব আমি।

গায়ত্রী বলল, একা একা দূরে দূরে পড়ে থাকি নিভা, মনের মত একটা মানুষ পাই না কথা বলবার। তোকে আমার এত ভাল লাগলো! কিন্তু কি ভয় হচ্ছে জানিস? মনে হচ্ছে, আবার কবে

দেখা হবে কে জানে। আমার এই সংসার আর ওই রুগ্ন বাপকে ফেলে কোথাও যেতেও পারি না যে আমি নিজেই চলে যাব তোর কাছে। তোকেও বলতে পারি না—রোজ রোজ আসবি।

নিভা বলল, আমি আসব দিদি।

কথা দিচ্ছিস ?

দিচ্ছি।

তাহলে ওই মিষ্টিটা খেয়ে ফ্যাল্। কুঁজো থেকে আমি জল গড়িয়ে দিই।

নিভা বলল, তোমার ভাইকে আগে খেতে বল।

বলছি। তুই খা।

গায়ত্রী জল গড়িয়ে আনল। একটি কাঁচের গ্লাস, একটি কলাই করা। বলল, আমাদের দুরবস্থা দেখে মনে-মনে হাসিসনে যেন।

ও-সব কথা বোলো না দিদি।

বলেই সে টপ টপ করে মিষ্টি চারটি খেয়ে নিলে। কাঁচের গ্লাসটি বাদ দিয়ে কলাই করা গ্লাসটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেতে লাগলো।

আহা-হা তোকে যে কাঁচের গ্লাসটা দিয়েছিলাম।

নিভা বলল, কাঁচের গ্লাস ঠুন্‌কো দিদি। ঠুন্‌কো জিনিসে আমার লোভ নেই। তাই কলাই-করা গ্লাসটা তুলে নিলাম।

গায়ত্রী আপন মনেই বলতে লাগল, বড়লোক আর গরীব—এ বড় সর্বনাশা জিনিস নিভা। মানুষের স্নেহ প্রেম ভালবাসা—সব-কিছুকে নষ্ট করে, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা নষ্ট হয়ে যায়।

নিভা বলল, আমি সেকথা জানি দিদি। একজন বড় আর একজন ছোট হয়ে থাকে। যে ছোট, সে হয়ত বড়র চেয়ে অনেক বড়, তবু তাকে মাথা হেঁট করে থাকতে হয় তারই কাছে—তার চেয়ে যে টাকায় বড়।

এমন সময় বিমল আসতেই তাদের কথা বন্ধ হলো।

গায়ত্রী বলল, খেয়ে নে বিমল। খাবারে মাছি বসবে।

বিমল বলল, হ্যাঁ নিই। নিভা তো রোজ আসবে না, রোজ এই-সব আনবেও না।

এই বলে সে নিভার দিকে তাকাল। নিভাও তাকাল তার দিকে।

গায়ত্রী বলল, ও কেন আনবে রে? আনবি তুই ও খাবে।

বিধাতা বেশ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু। বলতে বলতে বিমল খেতে লাগলো।—আমরা কাজ করবো, রোজগারের জন্যে মুখে রক্ত তুলে মরব আর মেয়েরা শুধু শুধু বসে বসে খাবে।

নিভার খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, দিদি, শুনছো?

গায়ত্রী বলল, শুনেছি। কিন্তু দিনকাল বদলে যাচ্ছে। মেয়েরাও আর বসে বসে খাচ্ছে না। তারাও বেরিয়ে আসছে সংসার থেকে। ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে জানি না বাবা। শুধু দেখছি ঘর সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

বিমলের খাওয়া শেষ হলো। জল খেয়ে বলল, আমাকে আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে দিদি।

আবার কোথায় যাবি?

বিমল বলল, দুটো ঠিকানা পেয়েছি। একজায়গায় নিজে গিয়ে দেখা করতে হবে, একজায়গায় চিঠি লিখতে হবে।

গায়ত্রী বলল, আজ আর গিয়ে কাজ নেই বিমল, আজ চিঠি-খানা লেখ। কাল দেখা করবি।

নিভা বলল, উনি যদি যেতে চান তো আমার গাড়ীতে যেতে পারেন। যেখানে যাবেন, আমি নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

কথাটা লোভনীয়। কিন্তু গাড়ীর কথায় বিমলের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সেই কথাটা দিয়ে নিভার প্রস্তাবটা সে

চাপা দিয়ে দিলে তক্ষুনি। বলল, দিদি, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। গাড়ীর কথা আমার মনেই ছিল না। দুটো ডিসে চারটে রসগোল্লা দাও তো, গাড়ীর সহিস-কোচুয়ান দুজনকে দিয়ে আসি।

ও মা, তাইতো! একেবারে ভুলে গেছি।

বলেই গায়ত্রী উঠলো।

বিমল বলল, ওদের কথা অনেকেই ভুলে যায়।

নিভা বলল ওদের না দিলেও চলে।

বিমল বলল, তোমরা বড়লোক, তোমাদের চলে কিন্তু আমাদের চলে না।

সহিস-কোচুয়ান ভারি খুশি! নিজে হাতে করে নিয়ে এলেন বাবু?

বিমল বলল, তাতে কি হয়েছে!

বিমল তাদের খাইয়ে ফিরে এসে বলল, দুটি দুটি চারটি মাত্র রসগোল্লা, কতই-বা দাম, কিন্তু ওদের আনন্দ দেখে যে-আনন্দ আমি পেলাম, আমাকে খাইয়ে তুমি সে-আনন্দ পেলে না নিভা!

নিভা হেঁটমুখে চুপ করে বসে রইলো।

গায়ত্রী ঘরে ছিল না, ফিরে আসতেই বিমল বলল, ওদের খাইয়ে তোমার ডিস, গ্লাস সব আমি ভাল করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি দিদি। শেষে আবার বোলো না যেন—ওগুলো ছুঁয়ে তোমাকে চান করতে হলো!

গায়ত্রী বলল, শুনেছিস নিভা, তোর কাছে আমাকে কেমন ছোট করে দিচ্ছে!

হাসতে হাসতে নিভা উঠে দাঁড়াল। বলল, এবার উঠি দিদি। সন্ধ্যে হয়ে গেল।

বিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, কোথায় যাবেন বলছিলেন চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাব।

বিমল চোখ বুজে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, না থাক। আজ আর সেখানে যাব না। চিঠিখানাই আজ লিখি।

নিভার মুখখানি শুকিয়ে গেল। ম্লান সেই চোখের দৃষ্টি তুলে একবার তাকালো গায়ত্রীর দিকে।

গায়ত্রী বলল, ওই তো বিমলের খেয়াল! যা বলে তা করে না, যা করে তা বলে না।

বিমল বলল, না দিদি খেয়াল নয়। যেখানে যাবার কথা, সেখানে যাব কিনা তাই ভাবছি।

যাবি না কেন? মাইনে কত?

মাইনে খুব ভাল। সপ্তাহে মাত্র তিনদিন পড়াতে হবে একঘণ্টা করে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

তাহলে যাবিনে কেন বলছিস? এ সুযোগ ছাড়ে?

বিমল বলল, সুযোগটা কিরকম শুনবে? আমারই জানা একজন প্রফেসার পড়াতেন মেয়েটিকে—

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, মেয়ে?

হ্যাঁ। আই-এ ক্লাসের ছাত্রী। ইতিহাস ইংরেজি—দু'টোতেই কাঁচা। প্রফেসার আমাকে সেখানে দিয়ে, নিজে ছেড়ে দেবেন কাজটা।

ছেড়ে দেবেন কেন?

মেয়েটি নাকি বাপের আদুরে মেয়ে। ভারি দুরন্ত।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, বয়েস কত?

বিমল হো হো করে হেসে উঠলো।

শোনো কথা! বয়েস কত, দেখতে কেমন—আমি কি বিয়ে করতে যাচ্ছি নাকি?

বিয়ে তো এমনি করেই হয় আজকাল। বলেই নিভা আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ালো না সেখানে। দোরের কাছ থেকে বলল, আমি আবার আসবো দিদি।

বারো

সপ্তাহ-খানেক পরে।

মেয়ে-পড়ানোর চাকরিটা বিমল পেয়েছে। দু'দিন মাত্র পড়িয়েছে মেয়েটিকে।

কিন্তু ভারি এক মুস্কিল বেধেছে পড়ানোর সময় নিয়ে। যে ছেলেটিকে সন্ধ্যায় পড়াতো বিমল, সেও বলে সন্ধ্যায় পড়বো, মেয়েটিও বলে সন্ধ্যায় পড়বো। সকালে কেউ পড়তে চায় না।

অথচ ছাড়তেও পারে না কাউকে। একটা চল্লিশ টাকা, একটা পঞ্চাশ টাকা।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বিমল ছেলেটিকে পড়াতে যায়, ঘণ্টাখানেক পড়িয়েই ছোটে মেয়েটির বাড়ী।

ছেলেটা টাল্‌বাহানা করে পড়তে যেদিন দেরি করে, সেইদিনই বাধে মুস্কিল।

তবে একটা সুরাহা এই যে, মেয়েটিকে পড়াতে হবে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন। সোম, বুধ আর শনি।

সেদিন ছিল সোমবার। দু'জায়গাতেই পড়াতে হবে। অথচ সকালে অমরেশের বাড়ী থেকে রামধনি এলো। গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলল, দিদিমণি, আজ বিকেলে আমাদের দিদিমণি আসবে। দাদাবাবুও আসবে সঙ্গে। এ-বাড়ীর দাদাবাবুকে বাড়ীতে থাকতে বলেছেন।

বিমল গিয়েছে বাজারে। বাজার যাবার পথে ডাক্তার-সরকারের সঙ্গে দেখা করে যাবে, তাই সেদিন তার দেরি হচ্ছিল ফিরতে। সোমবারের কথাটা মনে ছিল না গায়ত্রীর। রামধনিকে বলল, ঠিক আছে। আমি বলে রাখবো বিমলকে।

বিমল শুনেই তো মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

আজকের দিনটা ওদের আসতে বারণ করে দিলেই পারতে দিদি।

কেন? নিজে থেকে আসবে বলছে, আসুক না!

বিমল বলল, অমরেশ আসবে, আমি হয়ত থাকতেই পারব না। কোথায় ভবানীপুর, কোথায় শ্যামবাজার। দুটো টিউশনি।

গায়ত্রী বলল, তা হোক। তুই নাহয় দুটো কথা বলেই চলে যাবি।

তাই হবে।

বিমল সেদিন দুপুরে কোথাও আর বেরুলো না।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে এখনও তার দরখাস্ত করার বিরাম নেই। দুপুরে একটা কাজ যদি কোথাও পায় তো একটা টিউশনি ছেড়ে দেবে।

বিকেল চারটে বেজে গেল তখনও কেউ এলো না।

বিমল বলল, কি হবে দিদি, এখনও তো ওদের দেখা নেই।

দাঁড়া না, এই তো চারটে বাজলো। এত ছটফট করছিস কেন?

বুঝতে পারছিস না—নতুন টিউশনি যে! ফট্ করে কিছু যদি বলে বসে তো রাগের মাথায় দেবো হয়ত জবাব দিয়ে!

গায়ত্রী বলল, তাহলে একটি কাজ কর ভাই। রোজ রোজ মুড়ি খাওয়ানো উচিত নয়।

সন্দেশ এনে দেবো?

না, অনেক দাম।

তাহলে কি করতে হবে বল্।

গায়ত্রী একটু ভেবে বলল, ঘি আছে বাড়িতে। তুই কিছু ময়দা এনে দে।

আর কিছু?

না। আর কিছু না।

দোকান থেকে ময়দার ঠোঙা হাতে নিয়ে বিমল বাড়ী ফিরছিল।

যেই দোরের কাছে এসেছে, এমনি দুর্দৈব, ওদিক থেকে অমরেশের ঘোড়ার গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো।

গাড়ীর ভেতর থেকে বিভা চেঁচিয়ে উঠলো, বিমলদা!

থমকে থামতে হলো বিমলকে।

গাড়ীর ভেতর দেখল, নিভা আর বিভা। অমরেশ আসেনি।

বিমল জিজ্ঞেস করল, দাদা কোথায়?

সহিস দরজা খুলে দিল। গাড়ী থেকে নামতে নামতে নিভা বলল, দাদা আসছে। গাড়ীটা আবার পাঠিয়ে দিতে হবে।—দিন না, ওটা আর আপনার হাতে কেন?

বলেই সে বিমলের হাত থেকে ময়দার ঠোঙাটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। পেছন থেকে বিভা বলে উঠলো, আমি নেবো দিদি, আমাকে দাও।

সেও হাত বাড়ালো পেছন থেকে।

ওদিকে গলার আওয়াজ পেয়ে তখন বাড়ীর ভেতর থেকে গায়ত্রী বেরিয়ে এসেছে।

সুমুখে দিদিকে দেখে বিমল তার হাতের ঠোঙাটা নিভার হাতে ঠিক তুলে দিতে পারল না, নিভার হাতটাও কেমন যেন কেঁপে উঠল; ফলে হবার মধ্যে হল এই যে,—ঘোড়ার গাড়ীর পা-দানির ওপর কাগজের থলেটা উল্টে গিয়ে ময়দাগুলো সব মাটিতে পড়ে গেল।

বিভা হো হো করে হেসে উঠল। নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে নিভা না-পারল হাসতে, না-পারল কোনও কথা বলতে।

যাক গে।—বলে আবার ময়দা আনবার জন্য বিমল বাজারে ছুটল, নিভা একবার সেদিক পানে তাকিয়ে ভাবল তাকে নিষেধ করে, কিন্তু দিদির সুমুখে একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। সারা মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল শুধু।

নিভা বলল, গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও মৈনু, দাদা আসবে।

বলেই সে গায়ত্রীর দিকে ফিরে লজ্জায় ভাল করে কথা বলতে পারল না।—ছি ছি, কি কাণ্ডটা হয়ে গেল বলতো! এই বিভাই দিলে সব মাটি করে। আমাকে দাও, আমাকে দাও! দেখছিস একজন নিচ্ছে, কী দরকার ছিল তোর হাত বাড়াবার?

বিভাও লজ্জা পেয়েছিল খুব। হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদির তিরস্কার শুনছিল। গায়ত্রী তাকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, ওকে বকছিস কেন নিভা, ওর কি দোষ? যাও বিভা, তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও।

বিভা যেন বেঁচে গেল। ছুটে সে চলে গেল বাড়ীর ভেতরে।

বিভা চলে গেল, গাড়ীটাও তখন চলে গেছে, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে নিভা আর গায়ত্রী।

গায়ত্রী জড়িয়ে ধরল নিভাকে। বলল, কারও দোষ নেই, দোষ আমার।

তোমার দোষ?

আমার দোষ নয়? আমি এসে দাঁড়ালুম বলেই তো লজ্জায় হাতটা তোর কেঁপে গেল।

যাঃও!

দুজনেই চোখে চোখে চেয়ে হাসলো। তারপর নিভাকে নিয়ে গায়ত্রী এলো আবার সেই ঘরের ভেতর। সেই বিমলের ঘর। যে-ঘরে বসে নিভা সেদিন মুড়ি খেয়ে গেছে।

ঘরে ঢুকেই নিভা বলল, তুমি যা বলেছিলে ঠিক তাই। বিমলদা আবার তার বইগুলো সব ছড়িয়ে ফেলেছে।

গায়ত্রী বলল, এই তার স্বভাব।

সেদিন যেমন বসেছিল ঠিক তেমনি করে বিমলের খাটের ওপর নিভা বসলো। বলল, আচ্ছা দিদি, বিমলদা সেই কাজটা পেয়েছেন?

কোন কাজটা ?

সেই যে সেদিন শুনে গেলাম— একটি মেয়েকে পড়াবার কাজ।

গায়ত্রী বলল, পেয়েছে। আজকেই বিমলের সেখানে যাবার দিন। দুদিন পড়িয়েছে মেয়েটিকে। আজ তৃতীয় দিন।

নিভার মনে আগ্রহ জাগলো—এই মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু জানবার, কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারল না গায়ত্রীকে।

বিমলকেই বা কথাটা সে জিজ্ঞেস করবে কেমন করে ?

অথচ মনের কৌতূহলটা কিছুতেই চাপতে পারছে না সে।

শেষে বলেই বসলো নিভা : আচ্ছা দিদি, বিমলদা কি এর আগে কোনও মেয়েকে কোনোদিন পড়িয়েছেন ?

কই না। শুনিনি তো !

এই ছাত্রীটি কোন্ কলেজে পড়ে কিছু জানো তুমি ?

গায়ত্রী মুখ টিপে একটুখানি হেসে বলল, কেনরে, আমি মরতে ও-সব কথা জানতে যাব কেন ? তোর জানতে ইচ্ছে হয় বিমলকে জিজ্ঞেস করিস।

নিভা বলল, ওঁর সঙ্গে দেখাই হয় না—জিজ্ঞেস করবো কখন ? দাদা তো সেইজন্যেই আসছে আজ।

গায়ত্রী বলল, তবেই হয়েছে। আজ সে এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছিল। দুটো টিউশনিই পড়েছে সন্ধ্যেবেলায়। একটি শ্যামবাজারে, একটি ভবানীপুরে। আমিই বললাম, যাবার আগে আমাকে কিছু ময়দা এনে দিয়ে যা। রোজ রোজ নিভাকে আমি মুড়ি খাওয়াতে পারব না।

মুড়ি খেতে আমি কি নারাজ দিদি ?

বিমল ডাকল বাইরে থেকে : দিদি !

ওই এসেছে।

গায়ত্রী বাইরে বেরিয়ে গেল।

ময়দার ঠোঙাটি রান্নাঘরে রেখে গায়ত্রী এ-ঘরে এসে দেখে, বিমল দাঁড়িয়ে আছে নিভার কাছে।

গায়ত্রী বলল, বোস্ না একটুখানি। চট করে আমি খানকতক লুচি ভেজে দিচ্ছি, খেয়ে যা।

ময়দা কি আমার জন্যে আনলাম নাকি?

গায়ত্রী হেসে বলল, না। যারা এসেছে তাদেরও দু'-একখানা দেবো।

বিমল হাসলো নিভার মুখের দিকে তাকিয়ে।

নিভা বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। দিদি যখন এত করে বলছে আপনাকে।

আমার দেরি হয়ে যাবে যে! বলতে বলতে বিমল বসলো।

নিভা টিপ্পনি কাটল।—হোক্-না একটুখানি দেরি! ছাত্রী তো বকবে না আপনাকে! খেয়ে যেতে বলছে খেয়ে যান।

বিমল বলল, ওখানে গিয়ে আবার খেতে হবে।

শুনছো দিদি! বিমলদা ভাল ছাত্রী পেয়েছেন। মাষ্টারমশাইকে খাওয়ায় রোজ।

বিমল বলল, না না ছাত্রী কেন খাওয়াবে! ছাত্রের বাড়ী আগে যাই, সেখানে ছাত্রটা আসতে দেরি করে বলে বাড়ীর ভেতর থেকে কিছু জলখাবার-টাবার পাঠিয়ে দেয় আমার জন্যে। ছাত্রীর বাড়ী তো যাই রাত্রে।

এই শুনেই নিভা উঠলো। গায়ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, রাত্রে ছাত্রীকে পড়ানো ভাল, না দিদি? দিনের বেলা গোলমালে পড়াশোনা ভাল হয় না।

বলেই সে দিদিকে ঠেলতে লাগলো, চল দিদি, খাবার তৈরি করবে না?

তুই আবার কি জন্যে যাবি আমার সঙ্গে? তুই বোস না, বিমলের সঙ্গে বেশ তো গল্প করছিলি!

আর কোনও কথা না বলে দিদিকে সে একরকম টেনেই বের করে নিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরের বারান্দায় বিভা তখন হাত তালি দিয়ে দিয়ে পায়রা ওড়াচ্ছে।

ময়ুরকণ্ঠী একটা পায়রা টোঙের মুখে বসে বসে মাথা নাড়ছিল। ওদের কাজই এই। দিনরাত ওরা মাথা নাড়ে। তাই-না দেখে বিভাও তার থোপা-থোপা রেশমী চুলের গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে পায়রাটাকে ভেংচি কাটছিল। নিভা আর গায়ত্রীকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ছুটে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। বলল, দিদি দ্যাখো দ্যাখো, কেমন সুন্দর পায়রা! কেমন মাথা নাড়ছে দ্যাখো!

পাশেই বসেছিলেন রত্নেশ্বর। বিভার কথার জবাব না দিয়ে নিভা তাঁর কাছে গিয়ে রত্নেশ্বরের পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

কে মা তুমি?

গায়ত্রী বলে দিল—সেই যে সেদিন এসেছিল বাবা। অমরেশের বোন নিভা।

ও!

নিভা তখন বিভাকে ইসারা করে ডাকছে—কাছে এসে রত্নেশ্বরকে প্রণাম করবার জন্যে।

বিভা এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

রত্নেশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, এইটি বুঝি তোমার মেয়ে?

আঃ, বাবা! তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।

গায়ত্রী তার অর্দ্ধ উন্মাদ এই বাপটিকে তিরস্কার করে বলল, কাকে যে কি কথা বল তুমি! ও বিভা, ওর ছোট বোন। নিভার এখনও বিয়ে হয়নি।

রত্নেশ্বর বললেন, বেশ, বেশ, বেঁচে থাকো মা! আমার বিমলেরও এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের বড় জ্বালা মা। বিয়ে-থা মানুষের না করলেও নয়, আবার করলেও জ্বালা। ওই তো ছাখ না গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে! বিয়ে দিতে না দিতেই বিধবা হয়ে গেল।

রত্নেশ্বরের দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এলো।

গায়ত্রী নিভাকে টেনে নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

নিভা এই ঘরটা সেদিন ভাল করে দেখেনি। ছোট্ট একখানি ঘর। ওপরে টিনের চাল। বাঁশ দিয়ে বাঁধা। কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গায়ত্রী বলল, ডাক্তার-সরকারের ওষুধে বাবা উঠে বসেছে, পক্ষাঘাত ভাল হয়ে গেছে, কিন্তু মাথাটা ঠিক হয়নি এখনও।

নিভা কিন্তু সেকথায় কান দিল না। রান্নাঘরটি দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। বলল, এইটি বুঝি তোমার সংসার?

গায়ত্রী বলল, হ্যাঁ, এই আমার সংসার। আর আমার কি আছে বল্।

কথাটা বলতে গিয়ে কণ্ঠে তার বেদনার সুর বাজলো।

নিভা একবার তাকিয়ে দেখল এই তন্বী তরুণীকে।

বিয়ে হয়েছিল একটি মানুষের সঙ্গে। বিয়ের পরেই সে মানুষটি মরে গেছে। এবং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পিতযৌবনা সুন্দরী এই নারীরও মৃত্যু হয়ে গেছে। তার দেহ কিন্তু শোনেনি সে-কথা। সারা অঙ্গে যৌবনের সুষমা ফুটে বেরুচ্ছে। ফলবতী হবার জন্যে, সন্তানের জননী হবার জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন, সবই সে পেয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

কিন্তু সবই যেন তার কাছে বিধাতার পরিহাস!

কোনও পুরুষের সঙ্গ কামনা তার অপরাধ! দেহধর্ম পালন করা পাপ।

উনোনে আগুন গায়ত্রী দিয়েই রেখেছিল। আলুর দম এবং

আরও কি-যেন-সব সে তৈরি করে রেখেছে। এখন শুধু লুচি ভেজে দেবে!

একটা থালার ওপর ময়দা ঢেলে তাতে ঘিয়ের ময়েন দিচ্ছিল, নিভা তার কাছে গিয়ে বলল, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব দিদি, তুমি কিছু মনে করবে না বল।

গায়ত্রী কাজ করতে করতে বলল, ছাখ নিভা, তোর এই কথাটা শুনে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?

কি মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে—আমি তোকে যতখানি ভালবেসেছি, তুই আমাকে ততখানি ভালবাসিসনি।

নিভা বলল, না দিদি না, তা নয়। কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে আমার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করছে, দোষ-অপরাধ হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

গায়ত্রী বলল, না তোর কোনও অপরাধ হবে না। তুই বল্।

নিভা তখন সাহস পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্বামীকে মনে পড়ে দিদি?

বুঝেছি তুই কি জিজ্ঞেস করতে চাস্। বিয়ের একটি মাস পরেই তো বিধবা হয়েছি। দুটি রাত্রি—মাত্র দুটি রাত্রি তাকে কাছে পেয়েছিলাম। সে দুটি রাত্রি না পেলেই যেন ভাল হতো।

কেন দিদি?

গায়ত্রী ময়দা মাখতে মাখতে চোখ তুলে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসল নিভার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল, সে সব কথা কি তোর শোনা উচিত?

কেন উচিত নয়? আমি তো কচি খুকি নই!

গায়ত্রী বলল, বাবার হাতে টাকাকড়ি ছিল না, ছোট বয়সে বিয়ে দিতে পারেনি। বিয়ে যখন হলো তখন আমি বেশ বড়। সতেরো বছরের মেয়ে। এখন হলো পঁচিশ।

নিভা বলল, আমার হলো কুড়ি। গত বছর আমি বি-এ পাশ করেছি। কলেজে কিন্তু বয়েস আমার বেশি লেখা আছে। তা'হলে তুমি আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়।

গায়ত্রী বলল, তাই হবে। আমি কিন্তু লেখাপড়া কিছু শিখিনি। একেবারে আকাট্ মুখ্খু। চিঠিপত্র লিখতে পারি, বাংলা বই পড়তে পারি—এই পর্যন্ত। তাহলেই ভেবে ছাখ আমার মতন একটা বোকা মুখ্খু সতেরো বছরের মেয়ে—সবই তখন আমি জানি, সবই বুঝি, কত আশা কত স্বপ্ন নিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই মানুষটির হাতে। প্রথম রাত্রিটা কেটে গেল আদরে ভালবাসায়—কথায় আর কথায়। তারপর এলো দ্বিতীয় রাত্রি। আর শুনতে হবে না। যাঃ, পাজি মেয়ে! লুচি বেলতে পারবি তো? আমি লেচি কেটে দিই, তুই বেলে বেলে রাখ এইখানে।

নিভা চাকি-বেলন নিয়ে বসলো। গায়ত্রী উনোনে কড়াইটা চাপিয়ে দিয়ে বলল, মানুষ কি যে ওতে সুখ পায় জানি না। পায় নিশ্চয়ই, নইলে তুনিয়ার মানুষ ওরই জন্যে এত ছটফট করে বেড়ায় কেন? আমার জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম দিন বলে কিছু ভাল লাগেনি। সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠেছিল।

লুচি বেলতে বেলতে নিভা যেন আপন মনেই বলে উঠলো, তারপর?

গায়ত্রী বলল, তারপর আর কি! সেই প্রথম, সেই শেষ। শুনলাম, কোথায় যেন কার বিয়ে-বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে কলেরা হয়েছিল, মরে গেল। আমি কিন্তু খুব বেশি কাঁদতেও পারিনি। কার জন্যে কাঁদবো? পরিচয় যার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ হলো না, যাকে শুধু তুটি রাত্রির স্বপ্নের মত মনে হতে লাগলো—তার জন্যে কাঁদবো কেমন করে? পরে অবশ্য কেঁদেছিলাম। সেটা তার জন্যে নয়, নিজের জন্যে।

কষ্ট হয় না?

হয় মাঝে-মাঝে। মনকে ভুলিয়ে রাখি। তিরস্কার করি। সংসারের কাজ নিয়ে ডুবে থাকি। নিজের ভাগ্য বলে ধরে নিয়েছি জীবনের এই বিড়ম্বনাকে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নিভা।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো।

শুধু কড়াই-ঝাঁঝরার ঠুং ঠাং শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

নিভা কথা বলল, আবার কাউকে ভালবেসে তোমার বিয়ে করা উচিত।

গায়ত্রী বলল, বিমল একদিন এই কথা বলেছিল আমাকে। আমাদের কথাবার্তা যদি শুনিস তো অবাক হয়ে যাবি, ভাববি—ভাই-বোনে এ আবার কিরকম কথা!

নিভা জিজ্ঞেস করল, কি বলেছিল দিদি?

গায়ত্রী বলল, আমি একদিন রাগ করে বলেছিলাম, আমি আর খাটতে পারছি না বিমল, তুই বিয়ে কর, তোর বৌ এসে কাজকর্ম করুক। বিমল বলেছিল, আমাদের গরীবের সংসারে পরের মেয়েকে এনে কষ্ট দেবো না, তার চেয়ে তুই একটি বিয়ে করে চলে যা এখান থেকে। আমি বলেছিলাম, তুই শিক্ষিত ছেলে, বিধবা বোনকে বিয়ের কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না? বিমল বলেছিল—অশিক্ষিত হলে লজ্জা করতো দিদি, সংস্কারে বাধতো। কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, তোর মুখের দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। তুই কি এমনি করে নিজেকে মেরে সারাটা জীবন আমার সংসারে দাসীবৃত্তি করবি? আরও কত কথা, সে সব তোর শুনে কাজ নেই। তার চেয়ে যা তুই বিমলকে খাবার দিয়ে আয়।

নিভা এলো বিমলের খাবার নিয়ে।

বিমল তার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, দিদি তোমাকে খাটিয়ে নিচ্ছে বুঝি?

নিভা বলল, ইচ্ছে না থাকলে কেউ কাউকে খাটাতে পারে না।

এ-সব কাজ কি তুমি করেছ কোনদিন?

কুঁজো থেকে জল গড়াতে গড়াতে নিভা বলল, সেটা আমার দুর্ভাগ্য। এই কাজটাই মেয়েদের আসল কাজ।

বিমল বলল, তোমার দাদা এখনও এলো না। আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তাকে বোলো—আজ আমাকে দুজায়গায় পড়াতে যেতে হবে তাই আমি চলে গেলাম।

নিভা বলল, বলবো।

জলের গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে আবার বলল কি জানি বাবা, বিশ্বাস হচ্ছে না আপনাকে।

কেন?

আমাকে আপনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না - আমি জানি। তাই বোধহয় দুদুটো টিউশনি আছে বলে পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন। আবার বলছেন একটা শ্যামবাজারে, একটা ভবানীপুরে।

বিমল বলল, বিশ্বাস না হয় জেনে আসতে পার। ছেলেটা ভবানীপুরে—পঁচিশ নম্বর কাঁসারীপাড়া, আর মেয়েটা শ্যামবাজারে—পাঁচ নম্বর শ্যামপুকুর লেন। ভবানীপুরে আগে যাব, তারপরে আসবো শ্যামপুকুরে।

নিভা মনে মনে মুখস্থ করে নিল— পাঁচ নম্বর শ্যামপুকুর লেন। বলল, ছাত্রীটি তাহলে বাড়ীর কাছে?

হ্যাঁ। তোমাদের বাড়ীর কাছে, আমার নয়।

এই বলে ঢক্ ঢক্ করে জলটা খেয়ে নিয়ে বিমল উঠে দাঁড়ালো। বলল, চলি।

নিভা বলল, আমাদের বাড়ীর রাস্তাটা বোধ হয় আপনার মনে আছে?

কেন বল তো?

আমি অবশ্য আপনার ছাত্রী নই, তবু বলছি, দুপুরবেলা তো

আপনার কোনও কাজ নেই, পথ ভুলে যদি এক-আধদিন যেতে পারেন তো আমরা বাধিত হব।

বিমল যাবার আগে বলে গেল—দুপুরে আমার যদি কোনও কাজ না থাকতো, আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

দুপুরে আপনার কি কাজ শুনি ?

চাকরির সন্ধানে টো টো করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো।

কথাটা বলেই বিমল চলে গেল। দোরের কাছ থেকে বলে গেল —দিদি, চললাম।

এসো! বলেই গায়ত্রী ডাকলো, নিভা, বিভাকে ডাক। খাইয়ে দিই।

বিভা শুনতে পেয়েছিল কথাটা। উঠোনের একপাশে সে তখন কুকুরের বাচ্চা নিয়ে খেলা করছিল। বলল, যাচ্ছি।

নিভা বেরিয়ে এসে ধমক দিল বিভাকে।

—ছি, ছি, ওই নোংরা কুকুরগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছো ? যাও, ভাল করে হাত-পা ধুয়ে এসো তুমি রান্নাঘরে।

গায়ত্রী বলল, কইরে তোর দাদা তো এখনও এলো না ?

বিভা বলে, আসব যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই আসবে।

এদিকে যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসা, সে বন্ধুটি তো চলে গেল।

গায়ত্রী বলল, তোদের সেই মান্ধাতার আমলের ঘোড়ার গাড়ী —টিকির টিকির করে আসছে হয়ত। তোর দাদা একটা মোটর গাড়ী কিনলেই তো পারে!

নিভা বলল, বলেছিলাম একদিন। দাদা বলে, বাবার আমল থেকে আছে, থাক যতদিন থাকে।

বিভাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। খেতে খেতে বিভা বলল, দাদা বলেছে—দিদির বিয়ের সময় মোটর গাড়ী কিনবে।

গায়ত্রী হেসে বলল, তোর দিদির বিয়ে কখন হবে রে ?

দাদাকে জিজ্ঞেস করব।

গায়ত্রী বলল, আজই জিজ্ঞেস করিস। কুড়ি পেরিয়ে তো বুড়ী হতে চললো। এখন বিয়ে না দিলে আর কেউ বিয়েই করতে চাইবে না ও-মেয়েকে।

হো হো করে হেসে উঠল বিভা।

নিভাও সে-হাসিতে যোগ দিল।

আর সেই হাসির মাঝখানেই দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো অমরেশ।

মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল গায়ত্রীর। বলল, বন্ধুটি এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

অমরেশ বলল, আমি আসবো জেনেই চলে গেল নাকি?

না। সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। তাকে আজ দু'জায়গায় পড়াতে হবে।

অমরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

তেরো

একটার পর আর-একটা টিউশনি।

ভবানীপুর থেকে বিমল এলো শ্যামপুকুরে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। দেউড়িতে দরোয়ান বসে থাকে। মস্ত বড় লোহার কারবার আর তেলের কল। কলকাতা শহরে বাড়ীই আছে নাকি পঁচিশ খানা। অনেক টাকা ভাড়া পায়। নীচের সারি সারি ঘরে কর্মচারীরা কাজ করে। দোতলায় এদিকে ওদিকে অনেকগুলো ঘর। অনেক লোক। অনেক দাস। অনেক দাসী। কে যে কোথায় থাকে, কে যে মালিক কে যে নয় বাইরে থেকে এসে চট্ করে বুঝবার উপায় নেই।

দোতলার দক্ষিণদিকে প্রথমদিন বিমলকে যে ঘরখানা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বিমল সোজা সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘর-জোড়া নীচু তক্তাপোষের ওপর দামী একখানা মস্ত বড় কার্পেট পাতা। তার ওপর ধপধপে সাদা চাদর—রোজই বোধহয় বদলে দেওয়া হয়।

ঘর-দোরের শ্রীসৌন্দর্য্য কিছুই নেই। একটা দেওয়ালে রবি বর্মার একখানি জটায়ুবধের ছবি টাঙানো। আর-একটা দেওয়ালে অশীতিপর এক বৃদ্ধের ফটো। কোঁকড়ানো মুখের চামড়া, চোখদুটি দেখা যায় কি যায় না, গায়ে হরিনামের নামাবলী, হাতে হরিনামের ঝুলি। কাঠের একটি চেয়ারে বসে ফটো তুলিয়েছেন ভদ্রলোক। মনে হয় যেন ইনিই এবাড়ীর পূর্বপুরুষ। এই সব ঐশ্বর্য বোধকরি তাঁর নিজেরই উপার্জিত।

বিমল ভাবল, তার ছাত্রী নিভাননীকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

অন্যান্য দেওয়ালে পেরেক পোঁতা আছে, কিন্তু কোনও ছবি নেই।

বিমল গিয়ে বসতেই প্রতিদিনের মত কমবয়েসী একজন ঝি একটি ডিসে দুটি রসগোল্লা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এলো।

এটি তার নিত্য প্রাপ্য। প্রথম দিন থেকেই দেখছে—এই এখানকার নিয়ম।

বললেও শোনে না! জল আর রসগোল্লা সে আনবেই।

বিমল প্রথম দিনেই বলেছিল, এ আবার কেন? এ-সব এনো না, আমি খাব না।

ঝির বয়স বোধকরি নিভাননীর চেয়েও কম। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসে। কথার জবাব দেয় না।

বিমল সেদিন বলল, আজও আবার এই সব আনলে?

আবার সেই হাসি!

হাসছো কেন? এগুলো কে আনতে বললে তোমাকে?

হেসে বলল, তুমি খাও না!

আচ্ছা অভদ্র তো! 'তুমি' বলছে?

বিমল একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

বলল, ননী।

বলেই ফিক্ করে হাসি।

তোমার দিদিমণির নাম নিভাননী, আর তোমার নাম ননী?

এবার হাসলো না সে। বড় বড় চোখদুটি তুলে বলল, হুঁ।

বিমল খেয়ে ফেললে রসগোল্লা দুটি। ডিসের ওপর হাত ধুয়ে জলটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে দিতেই ননী জিজ্ঞেস করল, পান খাবে?

বিমল বলল, না।

এ-মা! তুমি পান খাও না?

না।

বিড়ি খাও?

না।

সিগ্রেট?

না।

মেয়েটা হাসতে হাসতে তক্তাপোষের একধারে মেঝেতে পা ঝুলিয়ে বসে পড়লো। পরিপূর্ণ যৌবন মেয়েটার। আঁটসাঁট গড়ন। স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ। মাথায় একমাথা চুল। সোনা দূরের কথা, দু'গাছা কাঁচেব চুড়িও নেই হাতে। গায়ে জামা পর্যন্ত নেই। একেবারে নিবাভরণ। গায়ের রংটা কালো যদি না হতো তো অনেক সুন্দরীকে সে হার মানাতে পারতো!

নিভাননী তখনও আসেনি। একা একা কী আর করবে বসে বসে। ঘরে একখানা বইও নেই যে পড়বে। কাজেই ননীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলো বিমল।

কতদিন আছ এ-বাড়ীতে?

ননী তার চোখ দুটোর সে-এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, অনে-ক দিন।

কে আছে তোমার?

মা আছে, আবার কে থাকবে?

মা তোমার কোথায় আছে?

এই বাড়ীতেই। আমাদের একটা ঘর আছে। সেই ঘরে আমি থাকি, আর মা থাকে।

বলেই সে হেসে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে লাগলো, না না আমি থাকি না, আমি থাকি না, আমার মা থাকে।

বিমল জিজ্ঞেস করল, তুমি তাহলে কোথায় থাকো?

ননী বলল, দিদিমণির কাছে।

সব সময় থাকো?

হুঁ। রাত্তিরে দিদিমণি শোয় খাটের ওপরে, আমি শুই নীচে। দিদিমণির পা টিপে দিই, গা টিপে দিই।

বলেই আবার হাসি। সে হাসি আর থামে না কিছুতেই।

দিদিমণি তোমাকে খুব ভালবাসে তাহলে?

হুঁ। খুব।

বিমল আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। বলল, দিদিমণির ভাই ক'টি ?

ও-মা, তাও তুমি জানো না ? তাহলে তুমি কিসের মাষ্টার ?

বলতে বলতে একটুখানি এগিয়ে এলো ননী। চুপিচুপি বললে, যদি কাউকে না বল তো বলি !

বলেই আবার পিছিয়ে গিয়ে বলল, না বাবা, বলব না। দিদিমণি শুনতে পেলে বকবে।

বললাম, না না-বল শুনি। আমি কাউকে বলব না।

ননী তখন বলবো না বলবো না করতে লাগল, আর একটি একটি করে সব কথাই বলতে লাগল বিমলকে।

কথাটা এমন কিছু গোপনীয় কথা নয়। তবু কেন যে এই মেয়েটা বলতে চাইছিল না কে জানে।

এই বাড়ীর বর্তমানে মালিক যারা—তারা তিন ভাই। ননী বললে, সেই যে কালো-মতন, মোটামতন, সেই যে এমনি বড় যার পেট,—তোমার সঙ্গে সেই যে একদিন কথা বলছিল সেই তো দিদিমণির বাবা। দিদিমণির তো মা নেই ! দিদিমণির একটা সৎমা আছে।

ননী আবার এলো এগিয়ে। ফিক্ করে একবার হাসল। হেসে বলল, না বাবা বলব না। শুনবে তো তোমার কানটা নিয়ে এসো আমার মুখের কাছে। আমি চুপি চুপি বলব।

বিমল তার মুখটা বাড়িয়ে দিলে।

ননী দুহাত বাড়িয়ে বিমলের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখখানা আরও খানিকটা এগিয়ে আনলো তার মুখের কাছে, তারপর ফিস ফিস করে বললে, মেয়েটা ভদ্দরলোকের মেয়ে নয়। বেউশ্যে।

শুনলে তো ?

আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগল ননী।

বিমল জিজ্ঞেস করল, কোথায় আছে সে?

এই বাড়ীতেই আছে। ওরে বাবা, তার কী দাপট! একদিন ঝাঁটার বাড়ী মেরেছিল আমাকে। কেন জানো? না বাবা বলব না।

বলবো না বলেই আবার বলল সে।

বললে, নিভাননীর সেই সৎমায়ের একটা নাকি ভাই আছে। সেই ভাইটা প্রায়ই আসতো এই বাড়ীতে। দিদির কাছে টাকাকড়ি নিতো আর খুব বাবুয়ানি করে ঘুরে বেড়াতো। প্রথমেই তার নজর পড়লো নিভাননীর ওপর। গাড়ীতে করে নিভাননীকে দিনকতক খুব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থিয়েটার-সিনেমা দেখালে। উপহারের জিনিস-পত্র কিনে দিলে। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে ননীকে নীচে এক প্লেট খাবার দিয়ে বসিয়ে রেখে, হোটেলের দোতলায় কি-একটা মজা দেখাবার জন্যে নিভাননীকে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো ননী। দিদিমণি তখনও আসছে না দেখে ননী নিজেই দোতলায় উঠে গিয়ে দেখে একটা কাঠের দেয়াল-দেওয়া ঘরের ভেতর থেকে নিভাননী চীৎকার করছে আর সেই ছোঁড়াটা বলছে, চুপ কর, নইলে গলা টিপে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো। ননীর শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। দোতলায় লোকজন কেউ নেই যে তাকে ডাকবে। খুব কম পাওয়ারের একটা বালব্ জ্বলছিল মাথার ওপর। সেই আলোয় দেখতে পেলে দূরে একটা টেবিলের ওপর পুরু কাঁচের লম্বা একটা দোয়াতদানি রয়েছে শুধু। সেইটে তুলে নিয়ে ননী এসে দাঁড়ালো বন্ধ দরজার সামনে। ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ করল। ভেতর থেকে নিভাননী চেঁচিয়ে উঠলো খুব জোরে। কিন্তু তক্ষুনি কে যেন তার মুখে চাপা দিল। ননী প্রাণপণে দোরের ওপর মারল ধাক্কা। দোরটা খুলে গেল। নিভাননীর তখন মাথার চুল গেছে খুলে। গায়ের জামা গেছে ছিঁড়ে। শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। খ্যাপা কুকুরের মত সেই ছোঁড়াটা

তখন ননীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দোরটা বন্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এলো। ননী কিন্তু তাকে ছাড়ল না। হাতের সেই পুরু দোয়াত-দানিটা তুলে সজোরে বসিয়ে দিতে গেল তার মাথার ওপর। ছোঁড়াটা হাত তুলে আটকাতে গেল। দোয়াতদানিটা লাগলো গিয়ে তার কনুইয়ের হাড়ে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গিয়ে সে হাতে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়লো খাটের ওপর। হাতটা ভাঙ্গলো কিনা দেখবার অবসর তখন কারও ছিল না। নিভাননীকে নিয়ে ননী হুড় হুড় করে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। হোটেলের দোরের সামনে তাদেরই বাড়ীর গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তাইতে চড়ে বসতেই ড্রাইভার সোজা চলে এলো শ্যামপুকুরের বাড়ীতে।

সব গল্পটা ননী সবিস্তারে শুনিয়ে দিলে বিমলকে।

শুনিয়েই ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতে বলল, সেই মামাবাবু তারপর তিনমাস আসেনি এই বাড়ীতে। সেই থেকেই তো দিদিমণির সঙ্গে ওর সৎমার ঝগড়া! ওরে বাবা, সে কী ঝগড়া। সৎমা'টা ভারি বজ্জাত যে! উল্‌টে বলে কিনা—তোরা দুই ছুঁড়িতে মিলে আমার ভাইকে দিলি খারাপ করে। দিদিমণির বাপটাও তেমনি। ওই মাগী যা বলে তাই শোনে। না বাবা, বলবো না। তুমি আবার বলে দাও যদি!

বিমল বলল, না বলবো না। কিন্তু তোমার দিদিমণি এখনও কেন আসছে না ছাখো তো!

ননী বলল, দিদিমণিরও মন-মেজাজ খুব খারাপ। পড়তে আর ইচ্ছে নেই। দিদিমণি বলে, মনের মতন একটি লোক পেলে সেও চলে যাবে এই বাড়ী থেকে। আমাকেও নিয়ে যাবে বলেছে।

এই বলে সে উঠলো।

জলের গ্লাস আর ডিস হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, এমন সময় নিভাননী ঘরে ঢুকলো।

আজ আমার একটু দেরি হয়ে গেল মাষ্টারমশাই।

ননী জিজ্ঞেস করল, ঝগড়া করছিলে নাকি দিদিমণি?

যাঃ! বলে এক ধমক দিয়ে তাকে প্রথমে বের করে দিল ঘর থেকে, তারপর বিমলের কাছে এগিয়ে এসে নিভাননী বলল, ননী এতক্ষণ কী করছিল আপনার কাছে বসে বসে?

বিমল বলল, মেয়েটা বড় ভাল মেয়ে। গল্প করছিল আমার সঙ্গে।

নিভাননী তার বইখাতা নামিয়ে পা মুড়ে বসলো বিমলের সামনে। বুকের কাপড়টা সরিয়ে জামায় গোঁজা ফাউন্টেন পেনটি তুলে নিল। তারপর খাতাটা খুলতে খুলতে বলল, ননীকে আপনার খুব ভাল লাগলো?

বিমল বলল, হ্যাঁ। বেশ মেয়ে।

ফিক্ করে একবার হাসলো নিভাননী।

হাসিটা নিরর্থক নয়, মনে হলো এ-হাসির যেন একটা মানে আছে। কিন্তু কী যে তার অর্থ—বিমল তা বুঝতে পারলে না। বলল, নাও পড়।

নিভাননী বলল, ননী কিন্তু ডেন্জারাস্।

বিমল চুপ করে রইল।

জবাব দেওয়া দূরে থাক, বিমলের কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল।

নিভাননী কিন্তু থামলো না।

ননী একেবারে বুনো সাঁওতালদের মত। হতভাগীকে এত যে বলি জামা গায়ে দে, জামা গায়ে দে, তা কিছুতেই দেবে না। আমার জামা একদিন ওকে পরিয়ে দেখেছিলাম—ঢল্ ঢল্ করে। বললুম—কেটে ছোট করে দিচ্ছি, পর। তাও না।

একটু থেমে আবার বলল, আমাদের বাড়ীটি একটি চিড়িয়াখানা। কত রকমের মানুষ যে আছে তার ঠিক নেই। সব কিন্তু জানোয়ারের মত। কত ধাক্কা যে সামলাতে হয় ননীকে—

বিমল আবার বলল, নাও পড়।

নিভাননী তার আগের কথার জের টেনে বলল, ননী কিন্তু ডেন্‌জারাস্। একবার যে ওর দিকে হাত বাড়িয়েছে, সে-ই ওর হাতে মার খেয়ে টিট্ হয়ে গেছে। জীবনে সে আর কখনও ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। একবার কি হয়েছিল জানেন?

বলেই মেয়েটা হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

হাসতে হাসতেই বলল, আমার এক মামা আছে—পাজির পাঝাড়া। তাকে সে এমন মার মেরেছিল যে একেবারে হাসপাতাল!

বিমল খুব অস্বস্তি বোধ করছিল।—তার এই মামার গল্প সে এইমাত্র শুনেছে ননীর কাছ থেকে। তবু সে কিছু বলতে পারল না। ছাত্রীর কাছ থেকে এ-সব কথা সে শুনতে চায় না।

অথচ প্রথম দিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে—মেয়েটির আগ্রহ যেন এইদিকেই বেশি। বয়সের একটা ধর্ম আছে, বংশানুক্রমিক একটি প্রভাব আছে, তার ওপর বাড়ীর আবহাওয়াটা খুবই খারাপ।

বিমল আবার একবার চেষ্টা করল তাকে পড়াবার। কিন্তু সেবারেও যখন পারল না, তখন বলল পড়তে কি তোমার ভাল লাগে না?

নিভাননী বলল, ভাল না লাগলেও আমাকে পড়তে হবে।

কেন?

নিভাননী বলল, দেখে-শুনে বুঝতে পারছেন না? ওই দেখুন।

বলেই সে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেয়ালে-টাঙানো নামাবলী গায়ে-দেওয়া হরিনামের মালা জপ-করা লোলচর্ম অশীতিপর বৃদ্ধের ছবিটিকে দেখিয়ে বলল, উনি আমার ঠাকুরদাদা। কিরকম মনে হয় মানুষটিকে? খুব ধার্মিক, না?

বিমল একটু হাসলো।

আমি দেখেছি ওঁকে। গত বছর মারা গেছেন তিরানব্বই বছর বয়সে। বেঁচে থাকতে আমি কোনদিনই তাঁকে হরিনাম করতে শুনিনি। অথচ লোককে দেখাবার জন্যে নির্লজ্জের মত কিরকম ছবি তুলিয়েছে দেখুন। লেখাপড়া একদম জানতেন না। জানতেন শুধু কেমন করে টাকা করতে হয়। ওঁর ছিল বন্ধকী কারবার। সোনার গয়না আর বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা দিতেন উনি। আর ছিল একটি তেলের কল—এখন হয়েছে তিনটি। যত ভেজাল সরষের তেল আপনারা খান—সব আমরা সাপ্লাই করি। এই বংশের মেয়ে আমি। আমাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও লেখাপড়া শেখেনি। আমিই একমাত্র মেয়ে—যে-মেয়ে কলেজে পড়ছে। আমি যদি বছর বছর ফেল করি, কিছু এসে যাবে না। কিন্তু পড়তে হবে। আমার বাবা, আমার কাকারা—লোকজনকে বলে আনন্দ পান—আমি কলেজে পড়ি। আমাকে চাকরিও করতে হবে না, টাকা রোজগারও করতে হবে না, কিন্তু বাপ্-কাকাদের আনন্দের জন্যে পড়তে হবে।

বিমলের ইচ্ছা করছিল সে বলে, তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দিলেই তো পারেন। কিন্তু কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

ভাল ছাত্রী পেয়েছে বিমল!

শুধু এই জন্যই বোধকরি প্রফেসার সোম এই ছাত্রীটিকে পড়ানোর চাকারটি স্বেচ্ছায় তার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এ চাকরি তার কতদিন থাকবে কে জানে।

বিমল হঠাৎ বলে বসলো, তুমি যেরকম গল্প করছ আমার সঙ্গে, আমার এই চাকরিটা থাকবে তো?

নিভাননী বলল, নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি যদি নিজে থেকে না ছেড়ে দেন, আপনাকে কেউ ছাড়াবে না। মাইনে আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।

কিন্তু তুমি যদি না পড, মাইনে আমি নেবো কেমন করে?

নিভাননী বলল, আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না মাষ্টারমশাই, কাল থেকে দেখবেন আমি ঠিক পড়বো।

বিমল বলল, তাহ'লে আমি আর বসে থেকে কি করব, আমি চলে যাই।

এরই মধ্যে যাবেন কেন স্যার, আর-একটু বসুন। আমাকে কি আপনার খুব খারাপ লাগছে?

বিমল বললে, না না খারাপ লাগবে কেন?

তবে যে পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন?

তুমি পড়ছ না যে!

বললুম তো পড়বো কাল থেকে।

ফেল্ যদি কর, তোমার বাবা কি ভাববেন বল তো?

বয়ে গেছে আমার বাবার ভাবতে! বাবার মাথায় অনেক ভাবনা।

বিমল বলল, ছাখো নিভাননী, আমি যেরকম দেখছি, আমার মনে হচ্ছে এই বাড়ীর আবহাওয়া থেকে তোমার একটু দূরে থাকা উচিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নিভাননী।

তা' যখন হবার নয় স্যার, সেকথা ভেবে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে আমি একটা কথা বলবো—আপনি কিছু মনে করবেন না বলুন!

না, কিছু মনে করব না। তুমি বল।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে। অনেক মাষ্টার আমাকে পড়িয়েছেন, আপনার মত এত ভাল মাষ্টার আমি কখনও পাইনি।

বিমল চুপ করে রইলো।

নিভাননী বলল, আপনার আরও টিউশনি আছে?

আছে।

সপ্তাহে আপনি আমাকে তিনদিন পড়ান, ওইটেকে যদি পাঁচ-দিন করতে পারেন তো আপনার মাইনে আমি একশ টাকা করে দিতে পারি।

বিমল কি যেন ভাবল। এবার তাবও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবাব পালা : দারিদ্র্যের জন্য এই মেয়েটিব অনুগ্রহ নিতে হবে।

বিমল খানিক ভেবে বলল- বেশ তো, পড়াব পাঁচদিন।

খুব খুশী হলো নিভাননী।

আজই আমি আপনাব মাইনে বাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

কেমন করে কববে ?

নিভাননী বলল, আমার সৎ-মাকে খুশী করবার জন্যে বাবা অনেক কাণ্ড করে। জলেব মত টাকা ওড়ায়। তাই আমি যাতে সেদিকে নজর না দিই তার জন্যে বাবা আমাকেও কম খুশী করবার চেষ্টা করে না। আমি যা বলি তাই করে। আপনাব মাইনে বাড়িয়ে দেওয়াটা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

বিমল আর কিছুতেই বসে থাকতে চাইল না সেখানে। বলল, আজ যখন তুমি পড়বে না নিভাননী, আজ আমি উঠি।

নিভাননী আর আপত্তি করল না, শুধু বলল, আবার আমাকে এই বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঢুকতে হবে। ভারি বিশ্রী লাগে স্যার। ননী যদি না থাকতো, আমি একদিন হয়ত এমন একটা কিছু করে বসতাম—যাকগে সেকথা।

বিমল চলে এলো সেখান থেকে।

মেয়েটা খারাপ নয়। কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য মনে হচ্ছে তার। তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। একজনের নাম নিভা, একজন নিভাননী আর একজন ননী। তিনটি তিন রকমের।

চৌদ্দ

রবিবার।

বিমলের হাতে কোনও কাজ নেই। ছেলে মেয়ে কাউকেই পড়াতে যেতে হবে না আজ।

ডাক্তার-সরকার নিজে এসেছিলেন সকালে।

বিমল জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ? নিজে এলেন যে?

ডাক্তার-সরকার হাসতে হাসতে বললেন, ভুলে যাচ্ছ কেন? কাল তুমি গিয়েছিলে? তোমার বাবার খবরটা অন্তত আমি রোজ চাই, বলিনি তোমাকে?

বিমল বলল, বাবা কাল ভালই ছিলেন তাই বোধহয় যেতে ভুলে গেছি।

ভুললে চলবে না। একবার করে যেও।

বিমল বলল, হোমিওপ্যাথি ওষুধ ভাল কাজ করে সে বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু সে যে এত ভাল সেকথা ভাবতে পারিনি।

ডাক্তার-সরকার বললেন, শুধু এই জন্যেই যারা এই ওষুধের গুণমুগ্ধ, তারা আর একে ছাড়তে পারে না। আমরা তিনপুরুষ ধরে হোমিওপ্যাথির প্রেমে পড়ে আছি। এক-একসময় মনে হয় মহাত্মা হ্যানিম্যান মানুষ ছিলেন না। মনে হয় তিনি আরও কিছু-দিন যদি বাঁচতেন!

রত্নেশ্বরকে ভাল করে দেখে এক পেয়ালা চা খেয়েই ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছিলেন, গায়ত্রী বলল, দাঁড়ান।

বলেই সে চারটি টাকা এনে ডাক্তারবাবুকে বলল, নিন, হাত পাতুন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ছি ছি ছি ছি, এই রকম করে আমাকে যদি অপমান কর তোমরা দুই ভাই-বোনে, আমি কিন্তু খুব রাগ

এই বলে হাসতে হাসতে তিনি ট্রামে উঠলেন।

সেদিন হয়ত বিমল যেতো না অমরেশের বাড়ী। কিন্তু ডাক্তার-বাবু বড় বেশি করে মনে করিয়ে দিয়ে গেছেন নিভাকে।

খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করেই বিমল বেরিয়ে যাবার জন্যে জামা গায়ে দিচ্ছিল। গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস ?

অমরেশের সঙ্গে দেখা করে আসি।

চল্ আমিও যাই তোর সঙ্গে। আমার একদিন যাওয়া উচিত।

বাবা একা থাকবে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা ভাল আছে। দাঁড়া, জিজ্ঞেস করি বাবাকে।

রত্নেশ্বর বললেন, যা না, আমার কোনও কষ্ট হবে না।

কিছু দরকার হয় যদি ?

কিছু দরকার হবে না জলের কুঁজো আর গেলাসটা আমার হাতের কাছে রেখে যা। সন্ধ্যের আগে আসিস কিন্তু, লণ্ঠন আমি জ্বালতে পারব না।

গায়ত্রী বলল, নিশ্চয়ই আসব।

দুই ভাই-বোনে চলে গেল অমরেশের বাড়ী।

গায়ত্রী ট্রামে উঠতে চাচ্ছিল না। বলল, চল্ আমরা হেঁটে হেঁটেই যাই। বাড়ীতে বসে থাকি, হাঁটা তো হয় না।

বিমল বলল, হাঁটা হয় না মানে ? আমি সারাদিনে যা হাঁটি তুই বোধহয় তার চেয়ে বেশি হাঁটিস—এ-ঘর ও-ঘর করে। ডাক্তার-সরকারকে সেদিন একটা লোক ভারি একটা মজার কথা বলেছিল। ডাক্তারবাবু তাকে বলেছিলেন, আপনি চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বসে থাকবেন না। একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। এটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। লোকটি পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো ডাক্তারবাবুকে। আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে বলছেন স্বাস্থ্যের জন্যে, আর বাড়ীর মেয়েরা ? তারা তো বাড়ীতেই থাকে, তাতে

তাদের স্বাস্থ্যের হানি হয় না? ডাক্তারবাবু হাসলেন। হেসে বললেন, বাড়ীর মেয়েরা আপনার চেয়ে অনেক বেশি হাঁটে। অনেক বেশি পরিশ্রম করে। এ-ঘর ও-ঘর করে দিনরাত তারা হাঁটছেই। তাছাড়া বাসন মাজে, বাটনা বাটে, জল তোলে, চাকা বেলুন দিয়ে রুটি বেলে, রান্না করে। সেগুলো বুঝি দেখতে পান না।

গায়ত্রী চুপচাপ পথ চলছিল। বিমল বলল, কেন তুই ট্রামে চড়তে চাচ্ছিস না বুঝতে পেরেছি। পয়সা খরচ হবে বলে। তোর কোনও ভাবনা নেই দিদি, আজকাল আমি ইচ্ছে করলে আরও টাকা রোজগার করতে পারি।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কেমন করে?

বিমল বলল, নতুন যে ছাত্রীটি আমি পেয়েছি সে কি বলে জানিস? বলে আমি যদি তাকে আরও তুদিন বেশি পড়াই তাহলে সে আমাকে একশ' টাকা মাইনে দেবে।

মেয়েটার পড়ায় বেশ মন আছে তাহ'লে বল্।

ছাই আছে। পড়ায় মন একেবারে নেই।

তাহ'লে আরও তুদিন পড়তে চাইছে কেন?

কথা কইবার মত মানুষ পায় না। আমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে চায়।

সর্বনাশ! ধাড়ী মেয়ে, তোর সঙ্গে গল্প করবে কি রে? কি গল্প করে?

বিমল বলল, আজে-বাজে ছাই-পাঁশ যা খুশী তাই. বলে যায়।

গায়ত্রী বলল. এই মরেছে! মেয়েটার বয়স কত?

অত সব জানি না। উনিশ-কুড়িও হতে পারে, বাইশ-চব্বিশও হতে পারে!

মেয়েটা দেখতে শুনতে কেমন? সুন্দরী? স্বাস্থ্যবতী?

বিমল বলল, সুন্দরী ঠিক বলা চলে না। তবে স্বাস্থ্যটা যেন

তার অতিরিক্ত ভাল। মানে বড়লোকের মেয়ে। খেয়েদেয়ে বেশ নাদুশনুদুশ হয়েছে। আদুরি-আদুরি গাব্‌লি-গুব্‌লি চেহারা।

এই বলে হাসতে লাগল বিমল। হাসতে হাসতে বলল, আর একটা কি মজা জানিস? দুটি মেয়ের সঙ্গে ইদানিং আমার পরিচয় হলো—একজনের নাম নিভা, আর এই ছাত্রীটির নাম নিভাননী।

বাঃ, বেশ তো!

বলেই গায়ত্রী বলে বসলো, হাঁরে নিভাননা মানে কি? চাঁদের মত মুখ? কিন্তু নিভা মানে তো চাঁদ নয়।

বিমল বলল, মোটেই না। নিভা নিভাননী দুটো কথারই কোনও মানে হয় না। নিভ মানে মত, সদৃশ, আর আনন মানে মুখ।

গায়ত্রী বলল, দাঁড়া আজ আমি বলবো নিভাকে।

বলবি নামটা তোমার বদলে নাও।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ। ফুটপাথ ধরে চলেছে তারা দুই ভাই-বোন।

গায়ত্রী কথা বলল প্রথমে। জিজ্ঞেস করল, তুই কি আরও দুদিন পড়াবি মেয়েটাকে?

বিমল বলল, মন্দ কি? বসেই তো আছি!

কিন্তু বড় ভয় করে বিমল।

আমাকে ভয় করে দিদি?

গায়ত্রী জবাব দিল না।

কি ভাবছিস?

না, ভাবিনি কিছু।

কোনও ভয় নেই দিদি, আরও দুটো দিন পড়াই। সংসারে আরও কয়েকটা টাকা আসুক।

তাই আসুক্। বলে গায়ত্রী সেই যে মুখ বুজে রইলো তো রইলোই!

বিমলের ভাল লাগছিল না। বলল, চল্ ট্রামে উঠি।

না, আর উঠবো না। অনেকখানা পথ তো চলে এলাম। বেশ তো যাচ্ছি কথা বলতে বলতে।

কথা তুই বলছিস কই? আমাব ছাত্রীর কথা শুনেই তো চুপ মেরে গেলি! আর একটা মেয়েব কথা যদি বলি তাহ'লে তো বলবি—ছাত্রী তোকে পড়াতে হবে না, তুই অন্য কাজ ছ্যাখ্।

আবার কোন্ মেয়ে?

বিমল বলল, এই নিভাননীব একটি ঝি, মানে ঝি ঠিক নয়, সহচরী। তারও নাম ননী। তাদেবই বাড়ীর বোধকবি কোনও পুরনো ঝি'ব মেয়ে। মেয়েটার বয়স বেশি নয়, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গড়ন, বংটা শুধু ফর্সা নয়। লেখাপড়া একদম জানে না।

গায়ত্রী বলল, তাব সঙ্গে তোব কি সম্বন্ধ? তাকেও কি তোকে পড়াতে হয় নাকি?

না। তাব কাজ—আমি যাবামাত্র একটি ডিসে তুটি বসগোল্লা আর একগ্লাস জল আমাব হাতের কাছে এনে দেওয়া।

তাব পর?

তাবপর যতক্ষণ না নিভাননী পড়তে আসে ততক্ষণ আমাকে সঙ্গ দান করে বাধিত কবা।

গায়ত্রী বলল, আমল দিস না। দূর করে তাড়িয়ে দিবি এই সব মেয়েকে।

তাড়ালে যায় নাকি? শুধু ফিক্ ফিক্ কবে হাসে।

গায়ত্রী বলল, বিমল, তুই আমাকে ভয় পাইয়ে দিলি।

না দিদি না, মেয়েটি বড় ভাল। ছোট্ট একটি পাখীর মত। কোন অভাববোধ নেই। সুতরাং আনন্দেই আছে দিনরাত। কী সুন্দর হাসি মেয়েটার! তুই যদি দেখতিস দিদি!

গায়ত্রী বলল, একেই তো বেশি ভয় রে! এর যে কোনও

সংস্কার নেই. কোনও বাঁধন নেই। শিক্ষা দীক্ষা কিছুই নেই বলছিস, ঝির মেয়ে—ভেসে যেতে পারে অনায়াসে।

বিমল জোর গলায় বলল, নাঃ, আমার বিশ্বাস ও ভাসবে না। ভাসে যদি তো ভাসবে নিভাননী। তবে আমার সঙ্গে ছাত্রীকে পড়ানোর সম্পর্ক দিদি। তার বেশি কিছু নয়। এই বিশ্বাসটুকু তুই আমার ওপর রাখতে পারিস।

গায়ত্রী এবার ওদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিল।

বলল, অমরেশের বোন নিভাকে তোর কি রকম মেয়ে মনে হয় বিমল?

বিমলের মুখখানা হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বলল, কোনও রকম মনে হওয়া-হওয়ির বাইরে। ও-মেয়ে যে কী তা আমি জানি না।

গায়ত্রী বলল, ও আবার কি রকম কথা? হেঁয়ালী-হেঁয়ালী শোনাচ্ছে। স্পষ্ট করে বল্—কি তোর ধারণা!

ওর সম্বন্ধে আমি কোন ধারণাই-বা করতে যাব কেন দিদি?

কেন করবি না?

না দিদি, ও আমাদের নাগালের অনেক বাইরে—আকাশের চাঁদের মত।

তা হোক্। তবু বল্।

তবু বলবো?

হ্যাঁ, তবু তোকে বলতে হবে।

বিমল একটু হাসল। বলল, নিভা কি তোকে কিছু বলেছে?

গায়ত্রী বলল, এরা কি মুখ ফুটে কিছু বলবার মেয়ে নাকি? এরা মুখে কিছু বলে না, কিন্তু যাদের দেখবার চোখ আছে তারা দেখতে পায়। আমার মনে হয়—

কি মনে হয়?

ও তোকে ভালবাসে।

বিমল বলল, তুই যা দেখেছিস সেটা ভালবাসা নয় দিদি—দয়া। অনুকম্পা। আমি গরীব, তাই ও আমাকে হয়ত একটুখানি কৃপার চক্ষে দেখে।

গায়ত্রী হাসলো। বলল, তা বেশ। ও না হয় একটু কৃপা করে, আর তুই কি করিস?

বিমল বলল, আমি ওকে ভয় করি।

দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠলো।

গায়ত্রী বলল, না না সত্যি করে বল্—তুই ওকে ভালবাসিস?

অপাত্রে ভালবাসতে যাব কোন্ দুঃখে?

ভালবাসা যে পাত্রাপাত্র মানে না বিমল।

বিমল বলল, মানে। একটুখানি বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেই মানে। তুই যেন অমরেশকে চট্ করে এই নিয়ে কোনো কিছু বলে বসিস্ না দিদি, খুব অপ্রস্তুত হয়ে যাবি।

গায়ত্রী বলল, তুই কি ভাবছিস—আমি তোদের ঘটকালি করব?

বিমল বলল, ছাখ, দিদি, নিতান্ত স্বার্থপরের মত আলোচনা করছিস তুই। আমার এখন যেরকম আর্থিক দুরবস্থা, এ সময় ও-সব কথা ভাবাই উচিত নয়। ধর্ নিভা যদি নিতান্ত দরিদ্রের একটি মেয়ে হতো, এমন দরিদ্র যে দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পেতো না, ভাল একখানা কাপড় পরতে পেতো না, অথচ আমাকে খু-ব ভালবাসতো, এমন ভালবাসতো যে একদিন হয়ত মুখ ফুটে বলেই বসলো—বিমলকে যদি না পাই তো আমি আত্মহত্যা করব। তাহ'লে তুই কি তার সেই স্বর্গীয় পবিত্র ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বলতে পারতিস—বিমল, এক্ষুনি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আয়! কখখনো বলতে পারতিস না। কারণ আমাদের সংসারে আর-একটি জীবন্ত প্রাণী—যার ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের প্রয়োজন—সেরকম

কাউকে ডেকে আনাই মানে অনন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা।

গায়ত্রী মুখ বুজে শুনল তার এই-সব কথা।

বিমল কিন্তু তখনও থামলো না। আবার বলল, নিভা আর আমার সম্বন্ধে এই যে ভালবাসাবাসির কথা তোর মনে জেগেছে, এ তো এমন নয় যে আমি একটি আশ্রম করেছি নিভা আমাকে ভালবেসে আমার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিতে চায়! এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ে। নিভা আমাকে ভালবাসে, আমি নিভাকে ভালবাসি, আমাদের বিয়ে হবে, নিভা আসবে আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীঠাক্‌রুণের মত, আর সেই লক্ষ্মীর পিছু-পিছু তার টাকার ঝাঁপিটা বয়ে আনবে তার বড়লোক দাদা—অমরেশ। অর্থাৎ কিনা তোর এই চিন্তার পেছনে—তোর অবচেতন মনে আছে আমাদের দারিদ্র্য-মোচনের স্বপ্ন। কাজেই এ চিন্তা করিস না দিদি, এর ভেতরে আছে মনুষ্যত্বের অবমাননা।

গায়ত্রী একেবারে চুপ করে গেল বিমলের কথা শুনে।

সত্যিই তো! এদিক দিয়ে কথাটাকে এমন করে ভেবে যে দেখেনি কোনোদিন।

পনের

হেঁটে হেঁটেই দু' ভাই-বোনে এসে হাজির হলো অমরেশের বাড়ীতে।

অমরেশ যত-না খুশী হলো, নিভা খুশী হলো তার চেয়ে বেশি। নিভা আর বিভা দুবোনে যেন গায়ত্রীকে নিয়ে কি করবে খুঁজে পেলো না।

বিভা প্রথমে টেনে টেনে গায়ত্রীকে তাদের ঘরগুলো দেখাতে লাগলো। বেচারা ছেলেমানুষ। দেখে এসেছে গায়ত্রীরা নিতান্ত ছোট বাড়ীতে বাস করে, তাই বোধহয় সে দেখাতে চাচ্ছিল তাদের বাড়ীখানা।—দ্যাখো, আমাদের বাড়ীখানা কিরকম বড়।

নিভার কিন্তু লজ্জা হলো। বিভাকে এক ধমক দিয়ে বলল, যা তুই ঠাকুরকে একবার ডেকে দে আমার কাছে। দিদিকে আমাদের ঐশ্বর্য দেখাতে হয় আমি দেখাচ্ছি।

বিভা চলে গেল ঠাকুরকে ডাকতে আর গায়ত্রীকে নিয়ে নিভা তার নিজের ঘরে গিয়ে বসলো।·· 'এসেছ তাহ'লে!'

বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস করতে পারি কই!

কেন?

বলবো?

বল্!

তোমার ভাইটি কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। সে যে কোনোদিন তোমাকে এখানে নিয়ে আসবে সেকথা আমি ভাবতেই পারিনি।

বিমলের কথা যখন তুলেইছে নিভা, তখন তার ইচ্ছে করছিল এই সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে; কিন্তু

যে-কথা বলে বিমল আজ তাকে থামিয়ে দিয়েছে, তারপর আর প্রবৃত্তি হয় না তাতে ইন্ধন জোগাতে।

এই মেয়েটা যে বিমলকে ভালবাসে তার পরিচয় সে পেয়েছে। কিন্তু বিমলেব মনের কথা নিভা এখনও বোধহয় টের পায়নি। টের পেলে কি যে সে করবে কে জানে। তার চেয়ে নিভাকে বলে দেওয়াই ভাল।

কেমন করে বলবে সেই কথাই বোধ কবি মনে মনে ঠিক কবছিল গায়ত্রী, এমন সময় ঠাকুর এসে দোরে দাঁড়াতেই নিভা উঠে গেল সেখান থেকে।

ঠাকুরের সঙ্গে কথা তখনও তার শেষ হয়নি, এমন সময় অমরেশ আর বিমল দুজনেই এলো গায়ত্রীর কাছে।

কথাটা গায়ত্রীর বলা হলো না।

অমরেশ বলল, আমি একটা খুব বিপদে পড়ে গেছি দিদি। আমাকে উদ্ধার করতে হবে।

তোমার আবার বিপদ কিসের?

অমরেশ বলল, কেন? আমার বিপদ থাকতে নেই?

গায়ত্রী বলল, না। বড়লোকদের বিপদ হয় না।

বলেই সে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

নাঃ, ভাই বোন দু'জনেই সমান। বড়লোকদের দেখতে পারো না তোমরা। তাহ'লেও শোনো কথাটা।

গায়ত্রী বলল, বলবেই যখন, তখন বল—শুনি।

অমরেশ বলল, আমার একটি বাড়ী আছে গিরিডিতে। সেই বাড়ীটা আমি বিক্রি করে দিতে চাই। মিছেমিছি সেখানে যাওয়া হয় না—এমনি পড়ে আছে বাড়ীটা একজন মালির হেফাজতে। বাড়ীখানা নষ্ট হতে বসেছে। একজন ভাল খদ্দেব পেয়েছি, তাকে সঙ্গে নিয়ে আজকেই যাব ভেবেছি। অথচ আমি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে নিভা বিভা একা থাকবে। এই হচ্চে এক নম্বর সমস্যা।

গায়ত্রী বলল, এ-সমস্যার সমাধান করতে হলে বিমলকে এই বাড়ীতে এসে থাকতে হয় তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, এই তো ?

অমরেশ বলল, না। আমার আর একটা কথা আছে।

বল।

আমার একটি ছোট্ট বাড়ী আছে—এই বাড়ীটার কাছেই। এই তো সুমুখের ওই গলিটার ভেতর। এতদিন সে বাড়ীতে ভাড়া ছিল। গত পরশু তারা উঠে গেছে। বাড়ীটা এখন ফাঁকা পড়ে আছে। তোমরা যদি কালই ওই বাড়ীতে উঠে আসতে পাবো, আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

বিমল বলল, বুঝেছিস দিদি, অমরেশ কি বলতে চায় ?

গায়ত্রী মুখ তুলে একবার তাকালো বিমলেব দিকে।

বিমল বলল, অমরেশের ওই বাড়ীটার ভাড়াটে উঠে গেছে, কলকাতা শহরে আর একজন ভাল ভাড়াটে পাচ্চে না অমরেশ। বেচারা ভারি কষ্টে পড়েছে, তাই আমার মত একজন ভাল ভাড়াটেকে বাড়ীখানা দিয়ে তার আর্থিক দুরবস্থা একটুখানি লাঘব করতে চায়। এখন বুঝেছিস তো ওর উদ্দেশ্য ?

গায়ত্রী বলল, বুঝেছি।

বিমল বলল, ওর ওই গিরিডি যাওয়া, বাড়ী বিক্রি করা—সব বাজে কথা। আসল কথা হচ্ছে—তোমরা আমার এই বাড়ীটাতে উঠে এসো।

অমরেশ বলল, তাই যদি হয় তো অন্যায় কিছু হয়েছে ?

হয়েছে। কারণ আমি ভাড়া না দিলেও তুমি চাইতে পারবে না আমার কাছ থেকে, আর বাড়ীখানা যেহেতু অমরেশের, সেই হেতু আমার ইচ্ছে হতে পারে—ভাড়া না দেবার।

অমরেশ বলল, আজ্ঞে না। ভাড়া আমি রীতিমত আদায় করব প্রতি মাসে। আমার কর্মচারী গিয়ে নিয়ে আসবে মাসে কুড়িটি করে টাকা।

কুড়ি টাকা ভাড়া ? পুরো একখানা বাড়ীর ?

অমরেশ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার আমার কর্মচারীকে।

বিমল বলল, কেন মিছেমিছি এ অন্যায় অনুরোধ করছো আমাকে অমরেশ ? আমি বেশ আছি।

তাহ'লে তুই আসবি না এ-বাড়ীতে ?

না।

খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি ?

না।

অমরেশ বোধকরি রাগ করল। তার মুখখানা দেখেই গায়ত্রী টের পেল ! বলল, কাল আমি তোমাকে বলব অমরেশ।

অমরেশ বলল, বেশ আমি তাহ'লে আজ আমার গিরিডি যাওয়া বন্ধ করলাম। কাল আমি তোমার জবাব নিয়ে যাহোক্ একটা ব্যবস্থা করব।

বিমল অনেকক্ষণ থেকেই মুচকি মুচকি হাসছিল। অমরেশের কথা শেষ হতেই বলে উঠলো, অমরেশের সব মিছে কথা দিদি, গিরিডিও যাবে না, কিছু না, ও আমাকে এইখানে এনে ফেলতে চায় ওর নিজের বাড়ীতে—অর্থাৎ কিনা বাড়ীভাড়ার জন্যে আমার দুর্ভাবনাটা কিঞ্চিৎ লাঘব করতে চায়।

গায়ত্রীর মুখ-চোখ দেখে মনে হলো যেন সে খুব একটা শক্ত কথা বলতে চাচ্ছে বিমলকে। কিন্তু চট করে বোধকরি সেটা সে সামলে নিলে। সাম্‌লে নিলে বিমলের মুখের পানে তাকিয়ে। ভাবলে হয়ত সে আহত হবে। শুধু বলল, ভালই তো ! অমরেশ তোমার বন্ধুর কাজ করতে চায়।

বিমল বলল, তাহ'লে আর এই সামান্য বাড়ীভাড়ার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কেন, অমরেশের সামর্থ্য যখন আছে তখন বন্ধুত্বের দাবীটাকে আর-একটু বাড়িয়ে আমার সংসারের সমস্ত ভার

ওর মাথায় চড়িয়ে দিয়ে বেশ আরাম করে বসে থাকি। না কি বল্ দিদি?

এই বলে সে অমরেশের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। বলল, এক-একসময় ইচ্ছে করে—আমার অকর্মণ্যতার সমস্ত বোঝাটা তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটাকে বেশ পাকাপাকি করে ফেলি। কিন্তু বিধাতা বিগ্‌ড়ে যান। পারি না কিছু করতে।

ঠাকুরকে বিদায় করে দিয়ে নিভা এতক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাগুলো। এবার তারও যেন অসহ্য হলো। রাগ হলো বিমলের ওপর। মানুষটি কি পাষাণ?

গায়ত্রীর হাতে ধরে নিভা বলল, কেন মিছেমিছি এখানে সময় নষ্ট করছ দিদি, এসো আমরা অন্য ঘরে যাই।

গায়ত্রী বলল, আমাকে যে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে নিভা। বাবাকে একা ফেলে রেখে এসেছি—

জানি। কিন্তু আমি যে তোমাকে তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারছি না দিদি। বল তো, রামধনিকে পাঠিয়ে দিই তোমাদের বাড়ীতে!

বিমল কথা বলল। অমরেশকে বলল, চল্ পালাই এখান থেকে। এরা আমাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

নিভা শুধু তার চোখের পাতাদুটি তুলে বিমলের দিকে একবার তাকালো।

চোখের সে ভাষা বিমল পড়তে পারলো কিনা জানি না, পড়তে পারলে বুঝতে পারতো—কী নিদারুণ অভিমান ছিল তার সে চোখের দৃষ্টিতে।

গায়ত্রীকে নিভাকে যেতে হলো না সে-ঘর ছেড়ে। অমরেশ আর বিমলই চলে গেল সেখান থেকে।

নিভা কোনও কথা বলতে পারছিল না। ভাবছিল—কি নিষ্ঠুর মানুষ এই বিমল। তাদের কাছাকাছি ওই ছোট বাড়ীটাতে

অমরেশ তাকে আনতে চাচ্ছে, অথচ সে আসতে চায় না। নোংরা ওই বাড়ীটাতে থাকে, মাসে মাসে ভাড়া দিতে পারে না, তবু তার কিসের আকর্ষণ ও-বাড়ীতে?

আকর্ষণ নয়। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিল নিভা। বিমলের সব কথা সে ভাল করে শোনেনি বোধহয়। তাই সে বুঝতে পারেনি বিমলের প্রত্যাখ্যানের হেতু।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছিস নিভা?

কিছু না। কই কিছুই তো ভাবিনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গায়ত্রী যেন আপন মনেই বলে উঠলো পৃথিবীতে বোধহয় দুটো মাত্র জাত আছে। এই দুটো জাতের মিল কখনও হবে না।

কি কি জাত দিদি?

গায়ত্রী বলল, বড়লোক আর গরীব লোক।

হঠাৎ এ-কথা কেন ভাবছো দিদি?

আমার ভাইটির কথা শুনে। তোর দাদা যখন বললে, সে তোদের কাছাকাছি একটা বাড়ীতে আমাদের তুলে আনতে চায়, আমি মনে-মনে ভাবলুম—ভালই হলো, ওই নোংরা বাড়ীতে আর থাকতে হবে না, বেঁচে গেলাম। আবার বিমল যখন বলল—

নিভা বোধকরি নিদারুণ অভিমানে জ্বলে পুড়ে মরছিল তখনও। কথাটাকে সে শেষ করতে দিল না। বলল, থামো দিদি থামো। তোমার ভাইএর ও ন্যাকামি আমার অসহ্য। বন্ধুর কাছ থেকে এ দয়া তিনি গ্রহণ করবেন না। 'বন্ধুত্বের দাবীতে আমার অকর্মণ্যতার বোঝা বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই!' আমি সবই শুনেছি দিদি। ও-সব বড় বড় কথা শুধু। ওতে অন্তরের স্পর্শ নেই। তবে শোনো দিদি, গিরিডি থেকে দাদার চিঠি এসেছে। দাদাকে গিরিডি যেতে হবে, সেখানকার বাড়ীটা বিক্রি করবার জন্যে কয়েকদিন থাকতে হবে, কথাটা তোমার ভাই যত সহজে মিথ্যে বলে

উড়িয়ে দিলে, আমি সেটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না, কেননা আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে চিঠি। এই নিয়ে কাল রাত্রে দাদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দাদা বলল, হ্যাঁরে গিরিডি গিয়ে যে দিনকতক থাকব ভাবছি, কিন্তু তোদের এখানে চাকর-বাকর আর কর্মচারীর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি যাই কেমন করে? বিমলকে এখানে দিনকতক থাকতে বলবো? আমি মনে মনে হাসলাম দাদার কথাটা শুনে। বললাম, বন্ধুটিকে তুমি চেনো না দাদা, সে থাকবে না। তারপর আমিই বললাম, তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাদের ওই যে ছোট বাড়ীটার ভাড়াটে চলে গেছে, ওইখানে ওদের এসে থাকতে বল। দাদা সেই জন্যেই বলেছিল। ভালই হয়েছে। দাদা জবাব পেয়ে গেছে মুখের মত। আর কোনোদিন কিছু বলবে না। আচ্ছা দিদি, তোমার ভাইটির হৃদয় বলে কি কোনও বস্তু নেই? একবার সে ভেবেও দেখলে না— আমার দাদা কতখানি দুঃখিত হবে তার এই কথা শুনে? মুখে নাহয় কিছু বলবে না, বিমলবাবুর মহত্ত্বের তারিফও হয়ত করতে পারে, কিন্তু মন তো সেকথা শুনবে না!

গায়ত্রী হাত বাড়িয়ে নিভাকে টেনে নিল তার নিজের দিকে। বলল, বিমলকে তুই ভুল বুঝিস না নিভা। কথাটা সে বলেছে অনেক দুঃখে। আমি আমার ভাইকে খুব ভাল করেই চিনি। সে আর যাই হোক্, হৃদয়হীন নয়।

নিভা বলল, না, নয় আবার!

বলেই সে তার মুখখানির সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, আমার যদি সে অধিকার থাকতো দিদি তো আমি ওর কল্পনার স্বর্গ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারতুম। ওর ওই পাথরের মত বুকখানা থেঁৎলে থেঁৎলে ভেঙ্গে—

বলতে বলতে খিল খিল করে হেসে নিভা একেবারে লুটিয়ে পড়লো গায়ত্রীর বুকের ওপর।

গায়ত্রী দুহাত দিয়ে চেপে ধরে রইলো তাকে।

খানিক পরে নিভা মুখ তুলে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বলল গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে, আসবে না তোমরা? দিদি।

গায়ত্রী তার নীচের ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কি যেন ভাবছিল।

নিভা বলল, ভাবছো কি দিদি? আমি আমার দাদার ওপর জোর চালাই আর তুমি তোমার ভাইএর ওপর জোর চালাতে পারো না?

ম্লান একটুখানি হাসলো গায়ত্রী।

নিভা বলল, হাসছো কি! আমি হলে জোর করে চলে আসতুম। বলতুম, থাক্ তুই তোর ওই প্রাইভেট্ ছাত্রীকে নিয়ে, আমি চললুম।

নিভা আজ রাগের মাথায় অনেকখানি খুলে ফেলেছে নিজেকে।

গায়ত্রী বলল, এক্ষুনি আমি বলছি বিমলকে।

নিভা বলল, আমি তাহ'লে সরে যাই এখান থেকে। বিভাকে দিয়ে ডেকে পাঠাই।

গায়ত্রী বলল, দাঁড়া দাঁড়া। কি খাওয়াবি খাইয়ে দে আগে। তার পর বলছি।

তর্ সইছিল না নিভার। গায়ত্রী দেরি করছে দেখে সে আবার বলে উঠলো, না দিদি, তুমি একেবারে বববাদ হয়ে গেছ। সবাইকে তুমি ভয় পাও।

গায়ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।—ভয় পাব না রে! তোদের এই হিন্দু সমাজ কি আমাকে কম ভয় দেখিয়েছে?

সেই কথাই তো বলছি দিদি। নিভা বলল, সমাজের ভয়ে নিজের এই রূপ, এই জীবন, এই যৌবন—তুমি একেবারে জলাঞ্জাল দিয়েছ। ভয়ে ভয়ে কোনও পুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকাওনি পর্যন্ত। সেই ভয় তোমার মনের ভেতর এমন ভাবে চেপে বসে

আছে যে, ভাইএর ওপর পর্যন্ত এই সামান্য জোরটুকু খাটাতে ভয় পাচ্ছ। আমার কি ইচ্ছে করে জানো দিদি? না—থাক্, বলবো না।

বল্ না!

না এখন না, পরে বলবো।

নিভা উঠে দাঁড়ালো। বলল, দেখি ঠাকুর এত দেরি করছে কেন?

গায়ত্রী তার হাতটা টেনে ধরলো। বলল, কি বলতে চাচ্ছিলি বলে যা। আমি না শুনে ছাড়বো না।

নিভা এগিয়ে এলো গায়ত্রীর কাছে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, দিদি না বলে তোমাকে বৌদিদি বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে!

বলেই চাপা হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

কিছু বলবার অবসর পেলে না গায়ত্রী। হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না। লজ্জায় কানদুটো তার রাঙ্গা হয়ে উঠলো শুধু।

ষোলো

বাড়ী ফিরে গিয়ে নিদারুণ ঝগড়া দু' ভাই-বোনে।

এমন ঝগড়া তাদের কখনও হয়নি।

গায়ত্রী বলল, এ তুই কী করলি বিমল ?

বিমল প্রথমে হেসে উঠেছিল তার কথা শুনে। বলেছিল, কি করেছি ? কিছুই তো করিনি।

গায়ত্রী বলেছিল, লেখাপড়া-জানা জ্ঞানীগুণী মানুষ কিনা, তাই বোধহয় বড় বড় কথার আড়ালে সত্যিকারের মানুষটাকে ঢেকে রাখতে চাস্ ?

তোর হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারছি না দিদি, খুলে বল্ কী আমি করেছি।

অমরেশকে ওরকম ভাবে আঘাত দিলি কেন বল্। এই বলে গায়ত্রী এগিয়ে এসেছিল বিমলের কাছে।

এ যেন যুদ্ধং দেহি ভাব। এরকম চেহারা দিদির সে অনেক দিন ছাখেনি।

বিমল বলেছিল, এই বাড়ী ছেড়ে ওর একখানা বাড়ীতে উঠে যাবার কথা বলছিস ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, জানিস্ সবই, বুঝতে সবই পেরেছিস্ কিন্তু এ তোর কিরকম ব্যবহার আমি বুঝতে পারি না। এই নোংরা বাড়ীটা ছেড়ে ওদের সেই বাড়ীতে উঠে গেলে এমন কী তোর ভাগবত অশুদ্ধ হতো শুনি ?

বিমল বলেছিল, অমরেশের ওপর তোর আজ একটু অতিরিক্ত টান মনে হচ্ছে।

ব্যস্, আর যায় কোথা ! একে আজ নিভা ওদের বাড়ী থেকে আসবার সময় এই অমরেশকে জড়িয়েই তাকে এমন একটা কথা

বলেছে যে-কথা সহজে ভোলবার নয়। তার ওপর বিমলের কথাটাও কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা। গায়ত্রী দপ করে জ্বলে উঠলো।

এই নিয়েই হলো ঝগড়ার সূত্রপাত।

সামান্য কথা কাটাকাটি হতে হতে শেষে সেটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলো যে বিমল বলতে বাধ্য হলো—তারা যাবে এ-বাড়ী ছেড়ে অমরেশের বাড়ীতে।

সেই কথাটা বলবার জন্যই তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা বিমল গিয়েছিল অমরেশের বাড়ীতে। গিয়ে শুনল সে গিরিডি চলে গেছে।

বিমল জিজ্ঞেস করল, কবে ফিরবে?

নিভা গম্ভীরমুখে বলল, জানি না।

বিমল বলল, তাহ'লে কি সে আমার ওপর রাগ করেই চলে গেল নাকি?

নিভা বলল, রাগ তো সবার ওপর করা যায় না!

বিমল বুঝতে পারল কথাটার মানে। বলল, বুঝেছি।

ছাই বুঝেছেন! কিচ্ছু বোঝেননি আপনি।

বলেই চলে যাচ্ছিল নিভা। বিমল বলল, চলে যাচ্ছো?

এমন করে বলে না সে কোনোদিন। গলার আওয়াজটাও কেমন যেন অন্যরকম শোনালো নিভার কানে। ফিরে দাঁড়ালো সে। না দাঁড়িয়ে পারলো না।

ফিরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়েছিল একটিবার বিমলের দিকে। মুখে একটি কথাও বলেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিমল যা কোনোদিন করে না তাই করে বসলো। কোনোদিন যা বলে না তাই বলে বসলো।

নিজে থেকেই সোফার ওপর বসে পড়ে বলল, নিভা শোনো!

বিমলের খুব কাছে এসে দাঁড়ালো নিভা। হাত বাড়িয়ে নিভার একখানা হাত ধরে ফেলল বিমল। তারপর সেই হাতের দিকে

তাকিয়ে বলল, সত্যি করে কই বলো দেখি নিভা, তোঁমার দাদা—তারপর এই ধর তুমি—তোমরা সবাই আমার ওপর রাগ করেছ—তোমাদের এই বাড়ীতে না আসার জন্যে ?

নিভা তার হাতটা টেনে নিল। বলল, না না রাগ কেন করতে যাব ? আপনার ইচ্ছে হয় আসবেন, না ইচ্ছে হয় আসবেন না।

কথাটা রাগের কথা।

বিমল সোজা হয়ে বসলো। মনে হলো নিজেকে যেন সামলে নিলে। বলল, তাহলে তুমি বলতে পারছো না অমরেশ কখন্ ফিরবে ?

না।

নিভা একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বলল, ওখান থেকে আসবে শ্রীরামপুরে, তারপর আসবে এখানে।

এমন সময়ে বিভা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো—বিমলদা দিদিকে আনলে না ? একাই এলে ?

হ্যাঁ, একাই এলাম।

নিভা এক পা এক পা করে সরে একটুখানি দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিমল তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, শ্রীরামপুরে কি কাজ আছে অমরেশের ?

নিভা জবাব দিল না। জবাব দিল বিভা। বলল, ও হরি, তুমি তাও জানো না ? শ্রীরামপুরে দিদির বিয়ে হবে যে ! শ্রীরামপুর থেকে এক ভদ্রলোক দিদিকে দেখতে আসবে চিঠি লিখেছে।

বিয়ের কথায় মেয়েরা লজ্জা চিরকালই পায়। নিভাও বোধকরি সেই জন্যই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমল নিভার দিকে তাকালো। বলল, তোমার দিদিকে জিজ্ঞেস করতো—যে-বাড়ীতে আমাদের আসবার কথা সে-বাড়ীর চাবিটা কোথায় ?

বিভা বলল, চাবি রামধনির কাছে। ডাকবো রামধনিকে ?

ডাকো।

বিভা রামধনিকে ডাকবার জন্যে তখনও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি, এমন সময় টিপ্ করে একটা চাবি এসে পড়লো বিমলের গায়ের ওপর। চাবিটা তুলে নিয়ে সুমুখে তাকিয়ে বিমল একটু অবাক হয়ে গেল। দেখল, চাবিটা ছুঁড়ে দিয়ে নিভা সরে যাচ্ছে জানলার পেছন থেকে।

বিভাও সেটা দেখতে পেয়েছিল। হাসতে হাসতে আবার সে ফিরে এলো বিমলের কাছে। বলল, তবে যে দিদি বলছিল——তোমরা আসবে না।

বিমল বলল, আসবো তো, কিন্তু বাড়ীটা কোন্খানে তাও তো জানি না। দেখিয়ে দেবে কে?

বিভা বলল, এই তো কাছেই। চল আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

এই বলে বিমলের হাত ধরে বিভা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। পেছনে নিভার ডাক শুনে বলল, দাঁড়াও বিমলদা, দিদি কি বলছে শুনে আসি।

নিভা দাঁড়িয়েছিল একটা দেওয়ালের আড়ালে। বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

বিমলদাকে বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

পরেব দিন সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া করে বিমল প্রথমে গেল বাড়ীওলার বাড়ী। বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেকথা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

বাড়ীওলা জিজ্ঞেস করল, কম ভাড়ায় কোনও বস্তি-টস্তিতে উঠে যাচ্ছ বুঝি?

বিমল কোনও জবাব দিলে না। বাড়ীওলা বলল—যাও। আমার লোক গিয়ে দোরে তালা মেরে দিয়ে আসবে। তবে একটু

দেখেশুনে যেও। কমবয়সী একটা বিধবা বোন রয়েছে বাড়ীতে। দিনকাল ভাল নয়।

বিমল তাড়াতাড়ি চলে এলো সেখান থেকে। আজ তার অনেক কাজ। গায়ত্রীকে আর বাবাকে আগে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, তারপর ঠেলা ভাড়া করে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। ঝকমারি-ঝঞ্ঝাট কম নয়। অথচ একা মানুষ। কেমন করে সবদিক সামলাবে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরেই দেখে, অমরেশের বাড়ী থেকে ঘোড়ার গাড়ীটা এসেছে আর রামধনি এসেছে দুটো ঠেলাগাড়ী নিয়ে।

নিভা পাঠিয়ে দিলে বুঝি?

রামধনি বলল, হাঁ বাবু। দিদিমণি বলল, দাদাবাবুর যেন কোনও তক্‌লিপ্‌ না হয়।

তক্‌লিপ্‌ কিছু হলো না বিমলের। গায়ত্রী তার বাবাকে নিয়ে আগেই চলে গেল ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে।

গাড়ীটা আবার যখন ফিরে এলো, রামধনি তখন দুটো ঠেলা-গাড়ীতে বাড়ীর যাবতীয় জিনিসপত্র বোঝাই করে রওনা হবার উদ্যোগ করছে।

গাড়ীটা আবার ফিরিয়ে আনলে কেন?

কচুয়ান বলল, আমাদের দিদিমণি তো আবার পাঠিয়ে দিলেন। বললেন—দাদাবাবুকে নিয়ে এসো।

বিমলকে বাধ্য হয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে বসতে হলো।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চমৎকার দোতলা একখানি ছোট্ট বাড়ী। গায়ত্রীর সারাটা দিন লেগে গেল সবকিছু গোছগাছ করে গুছিয়ে বসতে।

গায়ত্রীর সঙ্গে বিমলের ঝগড়া মিটে গেছে।

হাসতে হাসতে গায়ত্রী বলল, বাড়ী হলো মনের মত, এবার

তোর রোজগার যদি একটুখানি বাড়ে, বাস্, তখন তোর বিয়ে দিয়ে দেবো।

বিমল বলল, শেষের কথাটা এখন বলিসনি দিদি। বিয়ে আমি করব না ভেবেছি।

গায়ত্রী টিপ্পুনি কাটতে ছাড়লো না। বলল, ভেবেছিস্ তো তুই অনেক-কিছু। এ-বাড়ীতেও তো আসবি না ভেবেছিলি।

বিমল আর কোনও কথাই বলল না।

গায়ত্রী বলল, চুপ করে রইলি কেন? কিছু বল্। কি ভাবছিস্?

বিমল বলল, ভাবছি—যে-মেয়েটিকে সপ্তাহে তিনদিন পড়াই, তাকে রোজই পড়াব। মাইনেটা বাড়বে তাহলে।

পড়াবার দিন কবে?

কাল।

বলেই বিমল হাসতে হাসতে বলল, আর-একটা নতুন কথা শুনেছিস দিদি?

কী নতুন কথা?

শ্রীরামপুরে নিভার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে গায়ত্রী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, হবে একদিন জানি। বড়লোক দাদা—বোনকে কি আইবুড়ো রাখবে নাকি চিরকাল? কোথায় শুনলি? নিভা বললে নাকি তোকে?

তাই পারে বলতে?

কেন পারবে না? তুই তো আর তাকে বিয়ে করবি না।

বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। গায়ত্রী আবার বলল, তোর সঙ্গে যে-মেয়ের বিয়ে হবে তার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। ভালই হয়েছে তোর সঙ্গে নিভার বিয়ে হয়নি।

বিমল হাসলো একটুখানি ম্লান হাসি। বলল, অমরেশ আমার সঙ্গে ওর বোনের বিয়ে দেবে কেন দিদি?

গায়ত্রী বলল, যাক্‌গে, তোর সঙ্গে ও-সব কথা বলে কোনও লাভ নেই। কথায় কথায় এক্ষুণি ঝগড়া হয়ে যাবে।

না না ঝগড়া হবে না দিদি, তুই বল্‌। বেশ লাগছে শুনতে।

হ্যাঁ, তা লাগবে বই-কি! আমার মন-মেজাজ ভাল নেই বিমল, আমাকে বকাসনে।

এই বলে বিমলকে গায়ত্রী থামিয়ে দিল।

এমন কতকগুলো চিন্তা আছে যে-চিন্তার হাত থেকে মানুষ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বিমলেরও হলো তাই। যখন থেকে সে শুনেছে শ্রীরামপুরে নিভার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে তার দাদা, তখন থেকে শুধু সেই একটা চিন্তাই বার-বার তার মনের মাঝে উঁকি মারছে।

উঁকি মারা উচিত নয়। কারণ নিভার সঙ্গে এমন কোনও ঘনিষ্ঠতা তার হয়নি যার জন্যে সে ভাবতে পারে নিভা তাকে ভালবাসে। মস্ত বড়লোকের মেয়ে নিভা তারই বন্ধুর বোন—সেই-বা তার মত একজন নিঃস্ব নিঃসম্বল দরিদ্রকে ভালবাসতে যাবে কোন্‌ দুঃখে! চোখের একটু চাউনি, দুটো-চারটে মিষ্টি কথা, তার ঘর-দোর পরিষ্কার করে দেওয়া, ঘরের চাবিটা গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলা—এই দিয়ে কখনও প্রমাণ হয় না যে, নিভা তাকে ভালবেসেছে। ওই বয়সের মেয়েরা ওরকমধারা উসখুস করেই থাকে। ওটা হয়ত তার বয়সের ধর্ম। ওকে ভালবাসা বলে না।

পরের দিন ভবানীপুরে পড়াতে গেল বিমল।

সারাটা রাস্তা শুধু ওই একটা কথাই ভাবতে ভাবতে গেল।

নিজেকে নিজেই সে কতবার কতরকম করে তিরস্কার করল। এই কি তার প্রেম করবার সময় নাকি? দুটো প্রাইভেট্‌ টুইশানি করে একটা অচল সংসারকে কোনোরকমে যে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে, ভাল একটা কাজ পর্যন্ত যে-মানুষ সংগ্রহ করতে পারে না,

একটি মেয়েকে ভালবাসবার কথা সে ভাবে কেমন করে? পুরুষ মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার তখনই পারে—যখন সে তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করে নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। অক্ষম অকর্মণ্য পুরুষের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। কোনও মেয়েকে ভালবাসা তো তার এক অমার্জনীয় অপরাধ।

সুতরাং ভালই হয়েছে—শ্রীরামপুরে নিভার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। বড়লোকের মেয়ে. বড়লোকের বাড়ীতে তার বিয়ে হোক! নিভা সুখী হোক!

ভবানীপুরেব কাজ শেষ করে বিমল এলো নিভাননীদের বাড়ীতে।

শ্যামপুকুরের সেই বাড়ী! তেমনি লোকজনের ভিড়। তেমনি সব। তেমনি গোলমাল হট্টগোল, তেমনি কাজকর্মের ব্যস্ততা।

এদের প্রচুর অর্থ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ এরা উপার্জন করে।

দোতলায় উঠতে হলে যে-রাস্তা দিয়ে যেতে হয় সেখান থেকে নীচের ঘরগুলো দেখা যায়। দেখা যায়---ঢালা তক্তাপোষের ওপর লোকজন বসে বসে এই এত রাত্রি পর্যন্ত কাজ করছে। এদের আপিসের নির্দিষ্ট কোনও সময় বোধহয় নেই। এরা সব সময়েই কাজ করে। এইখানেই থাকে, এইখানেই খায়, এইখানেই শোয়। তার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি মানুষের সামনে একটি কবে কাঠের বাক্স, আর একটি করে খেরোবাঁধা মোটা খাতা। তারা হাসছে, গল্প করছে, কাজ করছে। ঘর-জোড়া তক্তাপোষের এক পাশে খালি গায়ে বসে আছে নিভাননীর কাকা। ছোট একটা বাচ্চা ছেলেকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে সে বোধহয় খেলা করছে বসে বসে।

এই সব দেখতে দেখতে বিমল সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল।

বিমল কোনোরকমেই ভাবতে পারল না—মানুষ হিসাবে এদের চেয়ে সে নিকৃষ্ট। কিন্তু কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে; কি কর্মক্ষমতায়—সর্বপ্রকারে বিমল নিজেকে উৎকৃষ্ট ভেবে অন্যদিনের মত আজ আর সে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারল না। তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে কী লাভ তার হলো?

নিভাননীকে পড়াবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসতেই দেওয়ালে-টাঙানো সেই বৃদ্ধের ছবিটার দিকে তার নজর পড়লো। অন্যদিন এই মানুষটিকে সে মনে-মনে অবজ্ঞা করেছে। আজ মনে হলো—পৃথিবীতে ওই মানুষটিই বোধকরি খাঁটি মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মানুষ কতখানি উন্নত হয়েছে হয়ত সে জানতো না, হয়ত সে জানতো না—পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সভ্য দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা কত বেশি উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর অনেক তথ্য এবং অনেক তত্ত্বই হয়ত-বা ছিল তার অজানা। কিন্তু যে-জীবন সে যাপন করেছে সে জীবনের আহরণ-যোগ্য সুখ সে আহরণ করে গেছে।

একহাতে রসগোল্লার রেকাব আর একহাতে জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো ননী। হাসতে হাসতে সে-দুটি বিমলের হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভাল আছ?

বিমল তার মুখের দিকে তাকাল। এ-মেয়েটাও সুখী।

বিমল বলল, বোসো।

ফিক করে হেসে ননী বলল, বসবো?

হ্যাঁ বোসো।

তুমি লোক খুব ভাল। বলতে বলতে বসলো ননী। বসেই বলল, তোমার আগে যে-লোকটা ছিল সে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত।

এই বলে ননী আবার হাসতে লাগলো।

এটা এমন হাসির কথা কিছু নয়। তবু তার সবেতেই হাসি।

খেতে খেতে বিমলের হঠাৎ কি যে মনে হলো সেদিন কে জানে,

নজর পড়তেই মনে হলো এই কথাটা বলতে গিয়ে মুখখানি তার ম্লান হয়ে গেছে।

পড়াবার আগে বিমল একটা কাজের কথা পেড়ে বসলো। বলল, তুমি সেদিন বলেছিলে আমি যদি আরও দুদিন বেশি আসি এখানে, তাহ'লে আমাব মাইনেটা বাড়িয়ে দেবে—

কথাটা বলতে বিমলের খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই সে কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল।

নিভাননী সোজা হয়ে বসলো ভাল করে। খুব উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, আসবেন? হ্যাঁ, বলেছিলাম, একশ' টাকা দেবো।

বিমল মাথা নীচু করে বলল, আসব।

নিভাননী সেখানেও থামলো না। বলল, আর যদি গার্জেন টিউটারের মত থাকেন, তাহ'লে বলুন কত দিতে হবে? দুশ'— আড়াইশ'?

বিমল মুখ তুলে তাকাল। বলল, সে আবার কিরকম?

কিছু নয়। রোজই আসবেন। ধরুন, ছুটির দিনেও এলেন, আমাদের সিনেমা যাবার ইচ্ছে হলো, থিয়েটার দেখতে গেলাম, আপনি আমার সঙ্গে গেলেন।

চুপ করে রইল বিমল! মনে হলো কি যেন সে ভাবছে।

নিভাননীর দেরি হলো না তার মনের কথা বুঝতে। বলল, ননী আমাদের সঙ্গে থাকবে।

আড়াই শ' আর ভবানীপুরের ছেলেটা পঞ্চাশ, তিনশ' টাকা মাসে। মন্দ কি?

বিমল বলল, আমি একটি ছেলেকে পড়াই ভবানীপুরে। পঞ্চাশ টাকা পাই সেখানে। সেটা কি তাহলে ছেড়ে দিতে হবে?

ভবানীপুরে যান আপনি ছেলে পড়াতে? কেন এত কষ্ট করেন স্যার? আপনার টাকার খুব দরকার, না?

হ্যাঁ।

আপনি বিয়ে করেছেন ?

না।

যদি কিছু মনে না করেন তো বলুন না—কে আছে আপনার বাড়ীতে ?

আমার এক বিধবা দিদি, আর এক অসুস্থ বাপ। আর কেউ নেই।

নিভাননী চুপ করে কি যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, ছেড়ে দিন আপনি ভবানীপুরের টিউশনি। আমি যেমন করে পারি, মাসে মাসে তিনশ টাকা আপনাকে পাইয়ে দেবো। আপনি আমার গার্জেন টিউটার হয়ে যান স্যার !

বিমল বলল, ভেবে দেখি।

এতে ভাববার কি আছে ?

বিমল বলল, আছে, আছে। তুমি ছেলেমানুষ—বুঝতে পারছ না।

আমি ছেলেমানুষ ?

নিভাননী মুখ তুলে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। হেসেই আবার চোখ নামিয়ে নিল।

বিমল বলল, পঞ্চাশ টাকা থেকে একেবারে তিনশ' টাকার কথা তুমি যখনই বলবে তোমার বাবাকে, তোমার বাবা তক্ষুনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

নিভাননী বলল, আমি না তাড়ালে কারও সাধ্য নেই আপনাকে তাড়াবার।

বিমল বলল, বলছি তো ভেবে বলব। নাও পড়।

না আপনি এক্ষুনি বলুন। আমি বুঝতে পেরেছি—আপনার টাকার খুব দরকার।

বিমল বলল, আমার টাকার দরকার বলেই তুমি আমাকে টাকা দেবে ? আর তোমার পড়ার দরকার নেই ?

পড়ছি তো।

না পড়ছো না।

বইএর পড়া পড়লেই কি আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো?

পরীক্ষায় পাশ তো করতে পারবে।

পরীক্ষায় পাশ করতে আমি চাইনা। আপনার কাছে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে ইংরেজ জাতি কত মহৎ সেকথা আমার না জানলেও চলবে। অষ্টম হেন্‌রি কত বড় চরিত্রহীন লম্পট ছিল তাও যদি আমি না জানি তাতেও আমার ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করতে না পারলে আমার অনেক ক্ষতি।

সে আবার কি রকম কথা?

বিমল বলল, বেশি টাকা মাইনে দিয়ে কোনও কলেজের একজন মেয়ে-প্রফেসারকে রাখলে আরও প্রাণ খুলে গল্প করতে পারবে।

নিভাননী বলল, পারবো। কিন্তু তাতে আমার আনন্দ হবে না।

স্পষ্ট পরিষ্কার জবাব দিতে বিমল বাধ্য হলো। বলল, আমার কাছ থেকে যে-আনন্দ তুমি চাও, সে আনন্দ তুমি পাবে না।

আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন স্যার। অনেক পোড় খেয়েছি, জীবনে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি। যে বংশে আমি জন্মেছি, যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি—সেখানে আমার মত বয়েসের একটা মেয়ের পক্ষে নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়া—একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া খুব সহজ। আমি তা চাই না—সেখান থেকে আমি উঠে আসতে চাই বলেই আপনার মত মানুষের সঙ্গ কামনা করছি।

নিভাননীর মুখ থেকে এরকম কথা শুনবে বিমল আশা করেনি। কিন্তু এর জন্য একজন অবিবাহিত যুবকের সঙ্গ কামনার পশ্চাতে তার অবচেতন মনের কোনও গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা—তাই-বা কে জানে।

বিমল বলল, আরও ভাল করে ভেবে ছাখো নিভাননী, খুলেই

যখন সব কথা বললে তখন আমিও বলি। তোমার যে বয়স, এ-বয়সে দেহকে উপবাসী রেখে শুধু মনকে নিয়ে এগিয়ে চলা হয়ত-বা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী হবে তোমার মনের মত একটি স্বামী। তুমি বরং তারই সন্ধান কর। আজ আমি চললাম। পরশু আবার আসব। সেইদিন শুনবো তুমি ভেবে কি ঠিক করলে।

এই বলে বিমল উঠতে যাচ্ছিল, নিভাননী খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলল। বলল, যাবেন না মাষ্টারমশাই। তাহলে কি এই কথাই বুঝব আমি—আপনি ভয় পাচ্ছেন?

হ্যাঁ, তাও ভাবতে পার। দু'দিন আগে যদি তুমি এই কথা বলতে, ভয় আমি পেতাম না, তখন আমার মনের একটা নিরাপদ আশ্রয় ছিল, এখন সে আশ্রয়টা আর নেই।

নিভাননী বলল, আমার শেষ কথা বলব আপনাকে?

বল।

আপনার দিদি আছে না বললেন?

হ্যাঁ, আছে।

আপনি সেখানে ভয় পান না?

না।

তাহলে আমার কাছে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাকে আপনি অনায়াসে ভাবতে পারেন—আপনার ছোট একটা বোন।

আমিও ভেবে দেখি, তুমিও ভাবো। আজ আমি চললাম।

এই বলে বিমল সেদিন সত্যিই উঠে এলো নিভাননীর কাছ থেকে।

রীতিমত ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বিমল বেরিয়ে এলো সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ফটক পেরিয়ে। সুমুখের রাস্তাটা খুব বড় নয়। দোরের কাছে রাস্তার একটা আলো। বিমল হঠাৎ চমকে উঠলো

সেইদিকে তাকিয়ে। দেখল, সেই আলোর থামের গায়ে একটা হাত রেখে চুপ করে একা দাঁড়িয়ে আছে নিভা।

রাত্রি বোধকরি তখন ন'টা বেজে গেছে। এসময় একা নিভা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কাছে গিয়ে বলল, তুমি এখানে? এই বাড়ীতে আমি পড়াতে আসি তুমি জানলে কেমন করে?

নিভা শুধু বলল, জানি।

বলেই সে চলতে আরম্ভ করল।

তুমি কি একা হেঁটে হেঁটে এসেছ তোমাদের বাড়ী থেকে?

হ্যাঁ।

কেন? কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। চল।

'চলুন' না বলে 'চল' বললে নিভা। বিমল তাকাল তার মুখের দিকে। মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না সে।

কেমন যেন নিজেরই অজান্তে বিমল ডান হাতখানা বাড়িয়ে নিভার কাঁধে রাখল। বলল, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

নিভা তার জামার নীচে থেকে একখানি পোষ্ট-কার্ডের চিঠি বের করে বিমলের হাতে দিয়ে বলল, পড় এই চিঠিখানা।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিমল একটু দূরে একটা আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। পড়লো চিঠিখানা। অমরেশ লিখেছে গিরিডি থেকে। শ্রীরামপুরের যে-ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল তার দাদার সঙ্গে হঠাৎ গিরিডিতে দেখা হয়ে গেল। তার মা বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কাজেই ছেলের দাদা তোমাকে একটিবার দেখে আশীর্বাদ করে বিয়ের দিনক্ষণ সব ঠিক করে আসতে চান। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কাল সন্ধ্যায় কিংবা পরশু সন্ধ্যায় যাব। তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।

এই চিঠি!